রোশনচৌকি

শ্রীরমাপতি বসু

সাহিত্য কুটীর
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

দ্বিতীয় সংস্করণ—অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৬৩

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীঅন্নদা মুন্সী

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রিয়বরেষু

॥ এক ॥

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অচিরা জোরে জোরে পা ফেলে সিঁড়িতে ওঠে। ইস, এত রাত হ'য়ে গেছে! নিজের মনে মনে সে আরো কী বলতে বলতে উঠে আসে দোতলার বারান্দায়। সিঁড়ির বড় ঘড়িটায় সাড়ে এগারটা বাজার একটা ঘণ্টা শোনা গেল।

ছকু এ বাড়ীর পুরনো খানসামা। অচিরা ফেরেনি ব'লে সে অপেক্ষা করছিল। অচিরা ছকুকে সামনা-সামনি দেখে জিগেস করে: সাহেব ফিরেছে?

—হ্যাঁ মেমসাহেব। ছকু খুব সহজভাবে উত্তর দেয়।

—কতক্ষণ এসেছে?

—অনেকক্ষণ।

—সাহেব কোথায়? অচিরা আবার প্রশ্ন করে ছকুকে।

ছকু বলে: বেড রুমে।

—ও, ব'লে অচিরা গিয়ে ঢোকে শোবার ঘরে। ফ্যানের রেগুলেটারটা আর এক পয়েণ্ট বাড়িয়ে দিয়ে সে বসে পড়ে তার খাটের ওপর। অন্য আর একটি বিছানায় নবারুণ ঘুমোচ্ছে। তার বুকের ওপর খোলা পড়ে রয়েছে একটা আধুনিক আমেরিকান উপন্যাস। সারাদিন পরিশ্রমের পর নবারুণ ঘুমিয়ে

পড়েছে। অচিরা স্বামীর বুকের ওপর থেকে বইটা তুলে পাশের টেবিলে রেখে দেয়। ইচ্ছা করে অচিরার নবারুণকে ডেকে তুলে একটু কথা বলে, কিন্তু কী না জানি ভেবে সে আর তাকে ডেকে তুলল না। ঘরের জোরালো আলোটা নিভিয়ে নীল আলোটা সে জ্বেলে দিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে।

ছকু তখনও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তাকে দেখে অচিরা বললে: এত রাত অবধি তুমি জেগে আছ কেন ছকু?

ছকু যেন এ ধরনের প্রশ্ন আশা করেনি। তাই সে চমকে ওঠে অচিরার কথায়।

ছকু বলে: আপনার জন্যে।

অচিরা একটু কর্কশ সুরে বলে: আমার জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। যাও, শুতে যাও।

ছকু চলে যায় নিচে, তার ঘরে। অচিরা গিয়ে ঢোকে তার পাশের ঘরে কাপড় বদলাবার জন্যে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অচিরা নিজেকে ভাল করে দেখে, এমনভাবে সে নিজেকে কোনোদিন দেখেনি। চব্বিশ বছর বয়সে এই সে প্রথম তার উচ্ছ্বসিত-যৌবনে ভারাক্রান্ত দেহকে ভাল করে লক্ষ্য করল। সাদা জর্জেটের শাড়ী ও ব্লাউজে তাকে আজ নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। এর সঙ্গে মুক্তোর হার ও কানের টাব দু'টিতে অপরূপ দেখাচ্ছে অচিরাকে। নিজের দিকে তাকিয়ে সে নিজেই আজ মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকে। সারা দেহে ক্লান্তির ছায়া। চোখে তার

নিদ্রাকাতর চাহনি। চুলগুলো হাওয়ায় এলোমেলো হ'য়ে গেছে। অচিরা তার উস্‌কো চুলের মধ্যে দিয়ে দু' হাতের আঙুলগুলো চালিয়ে দিতে দিতে চেপে ধরে। আয়নার মধ্যে তার রূপ-লাবণ্য দেখে নিজেই বিমোহিত হ'য়ে যায়। নিজের মনে মনে বলে ওঠে: নবারুণ বোকা, একেবারে বোকা। সারাদিন শুধু কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। দুনিয়ার দিকে ফিরে তাকাবার ওর মোটে সময় নেই। আহা বেচারী নবারুণ!

অচিরা আস্তে আস্তে তার পোষাক বদলে ফেলে। মুক্তোর অলঙ্কারগুলো খুলে তুলে রাখে তার দেরাজের টানায়। অতি সাধারণ একটি শাড়ী প'রে আয়নার মধ্যে দিয়ে নিজেকে দেখে। সাধারণ আটপৌরে কাপড়েও তাকে বেশ মানায়। কেন জানিনা অচিরার নিজেকে আজ খুব ভাল লাগে। এত ভাল লাগে যে, সে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলে। হাসে, কাঁদে, গান গায়। নিশুতি রাত। দূর থেকে সানাই-এর সুর ভেসে আসছে তার কানে। সানাই মিলন উৎসবের কথা ঘোষণা ক'রে থাকে। এমনি একটি রাত্রে অচিরাও নবারুণকে গ্রহণ করেছিল। গ্রহণ করেছিল তাকে, একান্ত করে পাওয়ার জন্য। নবারুণকে তার প্রথমই ভাল লেগেছিল, আর সেই জন্যই সব কিছু বাধা-বিঘ্নকে উপেক্ষা ক'রে অচিরা তার বাবা অবনী মুখার্জিকে রাজী করিয়েছিল এই বিয়েতে। এমনি একটি রাত্রে অচিরা নবারুণকে কাছে পেয়ে জানিয়েছিল তার মনের অভিব্যক্তি। মনের মণিকোঠায় আসন পেতে দিয়ে জানিয়েছিল আবাহন।

নবারুণ অচিরার সকল কথায় সাই দিয়ে যেত বটে, কিন্তু অচিরা কোনোদিন তার মধ্যে কোনো সাড়াই পায়নি।

বিয়ের দিন প্রথম রাত্রে অচিরার বেশ মনে পড়ে, সে নবারুণকে খুব কাছে নিয়ে বলেছিল, তোমায় আমি নিজেকে সমর্পণ করলুম। দেখো, কোনো দিন যেন অবহেলা কোর না। আমি সব সহ্য করতে পারি—শুধু সহ্য করতে পারিনা মানুষের অবহেলা, ঘৃণা। দেখো, তুমি যেন ভালবাসতে কৃপণ হয়ো না। তা'হলে কিন্তু আমার দুঃখ ও লজ্জার সীমা থাকবে না।

নবারুণ তার উত্তরে বলেছিল, আমার মন উজাড় করে তোমাকে ভালবাসবো। তোমাকে যদি ভালবাসতে না পারি—তবে আমার বাঁচার আর অন্য কোন পথ নেই। আমার ভালবাসা দিয়ে তোমার সব লজ্জা ঢেকে দেবো।

বড় একটা আশা নিয়ে অচিরা তার জীবন সুরু করেছিল। কিন্তু কোথায় যেন ফাঁকি থেকে গেছে। অচিরা বুঝতে পেরেও তা নবারুণের কাছে প্রকাশ করেনি।

আজ সেই সানাই আবার রাত্রের স্তব্ধতাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিচ্ছে। অতীতের একটি দিনের স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠে তার বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে দেয়। অচিরা ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শোবার ঘরে এসে ঢোকে। অচিরার পিছু পিছু এসে ঢোকে ট্যাবি। সে ফিরে দাঁড়াতে ট্যাবি তার সামনের পা দু'টো উঠিয়ে দিয়ে ডাকতে সুরু করে: কুঁউ···কুঁউ। লেজ নাড়ে ট্যাবি, আরো আদর পাবার জন্য

ডাকে। ট্যাবি প্রাণীটি অচিরার খুব প্রিয়। এত রাত্রে অচিরাকে দেখে সেও তার আবদার করতে ছাড়ে না। অচিরা ট্যাবির মুখটা দু' হাত দিয়ে চেপে ধরে একটু ঝাঁকি দিয়ে দেয়। ট্যাবি তবু ডাকে ঃ কুঁউ···কুঁউ।

অচিরা ট্যাবির মাথাটা আর একবার নাড়া দিয়ে বলে ঃ তোর চোখে বুঝি ঘুম নেই? যা শুয়ে পড়গে যা। ট্যাবি তবু ডাকে ঃ কুঁউ···কুঁউ, আর লেজ নাড়ে।

অচিরা এবার ট্যাবির মাথায় একটু আলতো করে চাপড় দিয়ে বলে ঃ গো-অন ট্যাবি, গো-অন।

ট্যাবি এবার ধীরে ধীরে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে। অচিরা এসে শুয়ে পড়ে তার বিছানায়।

নবারুণ ঘুমোচ্ছে। ঘুমন্ত নবারুণকে একমনে দেখে অচিরা। লোভ হয় তার পাশে একটু শুতে।

কিন্তু অচিরার মন যেন তাতে সায় দেয় না। কিসের জন্য সে সঙ্কুচিত হ'য়ে যায়। নবারুণ শিশুর মত ঘুমোচ্ছে। পৃথিবীর সব কিছু এখন যেন তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। নির্বিকার চিত্তে সে ঘুমোচ্ছে আর আধনিমীলিত চক্ষে অচিরা তা নিরীক্ষণ করছে। একটা হতাশা, ক্ষোভ অচিরার মনকে ভারী করে তোলে। সে তার শত অনিচ্ছা সত্বেও চোখ বুজিয়ে ফেলে। মনে হয় তার—একটু আগে আসতে পারলে অন্তত নবারুণের সঙ্গে সে আলাপ করতে পারতো। কিন্তু মিনির জন্যই তো এত দেরী হয়ে গেল। মিনিদের বাড়ীতে মিসেস

নীতা সেনের সম্মানে ককটেল পার্টি ছিল। মিসেস নীতা সেন সম্প্রতি জেনেভা থেকে ফিরেছেন। আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে দেশে ফিরেছেন ব'লে মিনিদের বাড়ীতে পার্টির আয়োজন। অবশ্য মিনতির মা এই বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন ব'লেই পার্টি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। নয়তো কোনক্রমেই তা সম্ভব হ'ত না। মিসেস সেন তাঁর সাম্প্রতিক বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। দেশ-বিদেশের মেয়েদের জার্নাল থেকে এসেছিল সাংবাদিকরা, সংবাদ ও ফটো নিয়ে যেতে।

এই পার্টিতে অচিরার একটা লাভ হয়েছিল—তা হ'চ্ছে তার পুরনো বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া। তা ছাড়া, একসঙ্গে এমনিভাবে দেখা হওয়ার সুযোগ বা সুবিধে কৈ? জোর, পথে ঘাটে বা মার্কেটে দেখা হয়ে থাকে মাঝে মাঝে। দু' এক মিনিট দাঁড়িয়ে শুধু, কেমন আছিস, আর কী খবরের বেশী কোন কথাই হয় না। কিন্তু আজ মিনিদের বাড়ীতে বন্দনা, লতিকা মৈত্র, সাধনা সান্যাল, অরুণা গুহ,দীপ্তি ঘোষ, মীরা মজুমদারদের সঙ্গেও বেশ দেখা-সাক্ষাৎ হ'য়ে গেল। মনে মনে অচিরা ভাবে ঃ ইস, অরুণাটা যেন কী! একেবারে পিপে। একসঙ্গে বসে সাত পেগ শেষ করেও কোন রকম বেসামাল হয়নি। অচিরা অবশ্য খুব অল্প একটু পান করেছিল। তা না করলে ভদ্রতা রক্ষা করা যায় না। ড্রিঙ্ক করার জন্য নবারুণ অবশ্য কিছুই মনে করে না। কিন্তু আজ সবচেয়ে খারাপ লেগেছে বনানী মৈত্রকে।

মৃগাঙ্ক ঘোষের সঙ্গে কী বেহায়াপনা না করেছিল! সকলেই তো জানে মৃগাঙ্কর সঙ্গে তার একটু ঘনিষ্ঠতা আছে। তা ব'লে সকলের সামনে এ রকম আচরণ করা কোনো মতেই শোভন নয়। সাধনার বিয়ের পরে বেশ পরিবর্তন হয়েছে। স্বামী আই, সি, এস। দেশ-বিদেশে ঘুরে আর কিছু হোক না হোক—সামাজিকতাবোধ অন্তত তার হয়েছে। সাধনা-দম্পতীকে দেখে অচিরার একটু ঈর্ষা যে না হয়েছে—তা নয়। সবচেয়ে সুন্দর এদের তিন বছরের মেয়ে লুসি। কী সুন্দর না লুসি ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করে। লুসিকে খুব আদর করেছে অচিরা। সাধনাকে একদিন অচিরা চায়ের নিমন্ত্রণও করতে ভুল করেনি। হয়তো সাধনা আসবে না। কথার ধরন দেখে অচিরার তাই মনে হয়। আরো কত কী এলোমেলো চিন্তা এসে ভীড় করে অচিরার মনে।

দূরে গীর্জার ঘড়িতে একটা বাজার ঘণ্টা শোনা গেল। অচিরা বেড সুইচটা টিপে অন্ধকার করে দিল তার ঘর। সারা ঘরটিতে একটা জমাট অন্ধকার। সারা সহর ক্রমেই স্তব্ধ হ'য়ে আসছে। মাঝে মাঝে দু' একটা মোটর গাড়ীর ক্ষিপ্র গতিতে চ'লে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়। নির্জীব, নিস্তব্ধ সহর। এই সহরের কোন এক কক্ষে একটি মেয়ে শুয়ে শুয়ে শুধু সময়, পল, ক্ষণ গুনে চলেছে। ইচ্ছে করে তার চীৎকার করে ডেকে তোলে তার ঘুমন্ত স্বামী নবারুণকে। তাকে ডেকে বলে: জীবনের অপচয়ের জন্য জবাব দাও। অচিরা তো

এই জীবন কামনা করেনি। অচিরা তো নবারুণকে বিয়ে করেছিল ছোট্ট একটা শান্তির নীড় বাঁধবে ব'লে। তার এই ঐশ্বর্য, সম্পদ—এ সবই তো তুলে দিয়েছে নবারুণের হাতে। তবে কেন সে শান্তি পাচ্ছে না? তবে কেন সে আর পাঁচটা মেয়ের মত স্বামীকে নিজের মতন করে পাচ্ছে না? কী যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে অচিরা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে ভাবে তার অতীতের এক একটি দিনের কাহিনী। আজ এই মুহূর্তে তার যেন আত্মজিজ্ঞাসার সময় এসেছে। ভালবাসলে যে ভালবাসা পাওয়া যায় তার কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। এটা নির্ভর করে সম্পূর্ণ পরস্পরের মনের বোঝাপড়ার ওপর। নবারুণের কাছে সে যেন আজ অবাঞ্ছিতা। সারাদিন শুধু কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে নবারুণ বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকে। প্রথম প্রথম অচিরা এর জন্য আপত্তি করেছিল, কিন্তু যখন তার আপত্তি করায় কোনো ফল হ'লো না—তখন অচিরা নিজেকে সভা, সমিতি, পার্টি, সমাজসেবার কাজে নিয়োজিত করে রাখতে বাধ্য হ'লো। অচিরার দিকটা কেউ হয়তো বিচার করে দেখে না। নবারুণের দিকে তাকিয়ে অনেকেই হয়তো তাকে লক্ষ্য ক'রে দু'একটা মন্তব্য করে থাকে, যা অচিরার প্রতি অবিচারের রায় বললে ভুল হবে না।

একই কক্ষে একটি নর ও একটি নারী; যাদের পরস্পরের মিলনে মধুর হ'য়ে উঠতে পারতো আজকের এই রাত্রি। এমনি

একটি মধুর রাত্রির জন্য কত নর নারী না বিপথে চলে গেছে। এমনি একটি রাত্রিকে মধুরতম করে উপভোগ করার জন্য কত নর নারীর আত্মত্যাগের স্বাক্ষর আমরা পাই ইতিহাসে। কিন্তু, একই কক্ষে রাত্রির পর রাত্রি বাস ক'রে একজন আর একজনের হৃদয়ের কোনো খোঁজ রাখে না। যার ফলে নবারুণ ও অচিরার দাম্পত্য জীবনে একটি ফাটল দেখা যায়। মানুষের জীবনের পরম তৃষা যদি অপূর্ণ থেকে যায়—তা যেমন একদিক থেকে বেদনাদায়ক, অপর দিক থেকে তেমনই অবাঞ্ছনীয়।

দূরে কোনো এক চিলেকোঠার কার্ণিশে বসে একটি নিশাচর পাখী বুকফাটা চীৎকার করে যাচ্ছে। অচিরার মনে কেন জানিনা অমঙ্গলের কথা ভেসে ওঠে। সে তার বিছানা থেকে উঠে ঘরের পূর্ব দিকের জানলাটা বন্ধ করে দেয়। নিশাচর পাখীটির চীৎকার আর শোনা যায় না। কোথায় যেন তার চীৎকারের সঙ্গে অচিরার মনবিহঙ্গের একটি সম্পর্ক আছে। এই কথা ভাবতে ভাবতে সে যে কখন ঘুমিয়ে পড়ে—তা নিজেই ঠাহর করতে পারে না।

॥ দুই ॥

নবারুণ চক্রবর্তীর আসল নাম নিবারণ চক্রবর্তী। নিজের খেয়ালে সে বাপ-মার দেওয়া নামটা বদলে নিয়েছে সুবিধা মত। যাকে নিয়ে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে—সে কেন নিজের নাম বদ্‌লে ফেললে, তারও একটা বেশ ইতিহাস আছে।

আমার নায়ক নিবারণ চক্রবর্তীর চেহারাটা ছিল বনেদীঘরের ছেলের মত, কিন্তু আসলে সে জন্মেছিল কোলকাতার ইণ্টালী অঞ্চলের এক বস্তিতে। কোলকাতার পূর্বাঞ্চলের একটি নোংরা বস্তি। নর্দমার পাঁক ও পচা ডোবার গন্ধের জন্য সহজে কেউ এ পথে পা বাড়াতো না। মাটির দেয়াল আর টিনের চালের ঘর গুলোয় থাকে নানান জাতের লোক। বস্তির পূর্ব দিকে রেল লাইন। এ লাইন সোজা চলে গেছে ডায়মণ্ডহারবার, বজ্‌বজ্‌। আশে পাশে কয়েকটি কারখানা থাকার জন্য এই বস্তিতে কোলকাতার অন্য বস্তির তুলনায় লোক সংখ্যা একটু বেশী। চিম্‌নী ও রেলের ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় সব সময় ঘোলাটে হ'য়ে থাকে এই অঞ্চল। বাঙালী অবাঙালী বাসিন্দা। মুচি, ডোম, ছুতোর কামার, কেরানী, পিয়ন থেকে আরম্ভ ক'রে নানান জাতের মানুষ এখানে থাকে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরাও একই পুকুরে স্নান করে, একই কলতলায় সারিবন্দী হ'য়ে জল তোলে।

কোথাও এদের বিবাদ নেই। ছোটখাট কলহ যে এখানে হয় না—তা নয়। তবে তা মীমাংসা করার ভার ছিল সদানন্দ চক্রবর্তীর ওপর।

সদানন্দ চক্রবর্তী, নিবারণ চক্রবর্তীর বাবা। এই বস্তিতেই তাঁর জন্ম। বস্তির সকল অসুবিধাকে অম্লান বদনে মেনে নিয়ে তিনি এখানে থাকতেন। সেকালের এণ্ট্রান্স পাস। সদানন্দ বাবু চাকরি করতেন রেল কোম্পানীতে। বাঙলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার অপরাধে তাঁর ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ তাঁকে বরখাস্ত করেন। কয়েক বছর বসে থাকার পর সদাগরী অফিসে তাঁর একটা কেরানীগিরি জুটেছিল। কেরানীগিরি ক'রে সংসার প্রতিপালন করা খুব সহজসাধ্য নয়। দিনের পর দিন অভাব অনটনের মধ্যে সংসার চলছে। এদিকে সংসারে প্রত্যহ দু'বেলায় কুড়িখানা পাতের ব্যবস্থা করতে হ'তো সদানন্দ চক্রবর্তীকে। কোলকাতা কর্পোরেশনের ফ্রী প্রাইমারী স্কুলে চলতো ছেলে মেয়েদের শিক্ষা।

একদিকে দারিদ্র্য, অপরদিকে শিক্ষাভাবে এই বস্তির নির্জীব ছেলেমেয়েগুলো কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্য জুঝে চলেছে। মজুর, মেথর, ডোমের সংখ্যা এখানে বেশী। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পর—রাত্রে এরা ঢোল বাজিয়ে গান সুরু করে। তার সঙ্গে চলে তাড়ি ও দেশী মদের হল্লা। বয়স্কদের কাছে থেকে ছেলেরা শেখে অশ্লীল গালাগালি। তর্জা, কুস্তি, রামায়ণ পাঠ থেকে সুরু ক'রে এখানে চলে জুয়া, তাস,

দড়ির খেলা। এখানে যারা থাকে—তাদের জীবনে যেন কোনো আশা নেই। কোনরকমে দিন কাটিয়ে দেওয়ার জন্য এরা বেঁচে থাকে।

দু' একটা রাজনৈতিক দল মাঝে মাঝে এখানে এসে নৈশবিদ্যালয় চালাবার জন্য তোড়জোড় করে—তারপর যে কোনো কারণেই হোক, তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়তো তারা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি নিয়ে এখানে এসে থাকে। তাদের অভিসন্ধি পূর্ণ হ'লে নৈশ বিদ্যালয়ের ঝাঁপ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু সদানন্দ চক্রবর্তী এই বস্তিটিকে কোলকাতার একটা আদর্শ বস্তি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। সংস্কার করার জন্য জমীদারদের সঙ্গে দিনের পর দিন লড়াই করেও তা কোনো দিন সার্থক হয়নি। চারিদিকে শুধু জীবনের ব্যর্থতা। সে এক অদ্ভুত পরিবেশ। বস্তি জীবনের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ আছে, তাঁরা ছাড়া আর কেউই এই পরিবেশকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন না।

এরই মধ্যে, হঠাৎ একদিন সামান্য জ্বরে সদানন্দ চক্রবর্তী মারা গেলেন। নিবারণের বয়স তখন মাত্র আট বছর। সদানন্দ-বাবুর মৃত্যুতে সংসার একেবারে অচল হ'য়ে পড়ল। বিধবা স্ত্রী ও দু'টি নাবালক ছেলেমেয়ে ছাড়াও তিন চারজন নিকট-আত্মীয় এই পরিবারভুক্ত ছিল। বহু আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, বান্ধব থাকা সত্ত্বেও দিনের পর দিন এই অসহায় পরিবারটি অনাহারে

অর্ধাহারে দিন কাটাতে লাগল।

দেশে বহু অনাথ আশ্রম ও হিন্দু দাতব্য প্রতিষ্ঠান সেদিন ছিল ও আজকের দিনেও আছে, কোথাও এরা ঠাঁই পেল না। অভিশপ্ত জীবন নিয়ে সদানন্দ চক্রবর্তীর সমগ্র পরিবারটি পথের ধুলোর মত সহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে শুধু ভেসেই চলল। কোথাও তারা খেয়ে প'রে, বেঁচে থাকার আস্তানা খুঁজে পেল না! হঠাৎ একদিন একটি মিশনারী পাদরী এগিয়ে এলো এদের বাঁচানোর জন্য। কিন্তু সে দান ও দাক্ষিণ্যের সঙ্গে ছিল একটি সর্ত। সমগ্র পরিবারটিকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ ক'রে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। সদানন্দ চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রী বিনা দ্বিধায় পাদরীর সকল সর্তকে মেনে নিলেন।

পাদরীর প্রচেষ্টায় নিবারণ ঠাঁই পেল একটি অনাথ আশ্রমে। খৃষ্টধর্মাবলম্বী হওয়ার জন্য গীর্জের তহবিল থেকে পরিবারটি প্রতিমাসে সাহায্য পেতে লাগল। এদিকে নিবারণ সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে গেল তার পরিবার থেকে। আট বছরের বালক—সুরু করল তার নতুন জীবন। গীর্জের প্রার্থনায় যোগ দেয় আর মিশনারী স্কুলে করে লেখা-পড়া। পাদরী সিগমণ্ড অত্যন্ত স্নেহ করতেন নিবারণকে। সপ্তাহে একদিন করে অনাথ আশ্রমে গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন নিবারণের। পাদরী সিগমণ্ডের নিবারণকে নাম ধরে ডাকতে অসুবিধা হ'তো। তিনি বলতেন—নবারুণ। সেই থেকে নিবারণের নাম হয় নবারুণ। এমনি করে সদানন্দ চক্রবর্তীর সমগ্র পরিবারের জীবনের ধারার সম্পূর্ণ

পরিবর্তন হয়। বস্তির সেই পঙ্কিল আবহাওয়ার পরিবর্তে এক সুন্দর, সুস্থ পরিবেশে নিবারণ ওরফে নবারুণ বড় হয়ে উঠতে লাগল। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করার পর নবারুণ মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স নিয়ে চলে যায় বিলেত। ছ'বছর পাশ্চাত্ত্যের বিখ্যাত বিখ্যাত বন্দরে শিক্ষানবিশী থাকার পর বিলিতী ডিগ্রী নিয়ে সে যখন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান সহর কোলকাতার মাটিতে পা দিল, তখন সে এক নতুন মানুষ। তার পোষাক, পরিচ্ছদ, চলা-ফেরার মধ্যে পুরোদস্তুর সাহেবিয়ানা। তখন তার নাম দাঁড়াল জন নবারুণ চক্রভার্টি। সঙ্গে সঙ্গে জুটে গেল চাকরি কোলকাতার কোনো এক বিখ্যাত বিলিতী জাহাজী কোম্পানীতে। কখন সে জলে, আবার কখন মাটীতে মাসাধিক কাল কাটায়। জাহাজে চড়ে নাবিকদের সঙ্গে পৃথিবীর এক বন্দর থেকে অপর বন্দরে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আবার যখন জাহাজ এসে নোঙ্গর করেছে কোলকাতার বন্দরে—তখন সে বিদেশী নাবিকদের মত ঘুরে বেড়িয়েছে কোলকাতার পথে ঘাটে। বাঙলার সবুজ মাটির আকর্ষণে অনেক সময় তার ইচ্ছে করেছে স্থায়ী হ'য়ে এখানে বসবাস করতে কিন্তু দাসত্বের শৃঙ্খলে যে জীবন সে বন্ধক দিয়েছে—তার মুক্তি নেই। মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছে মৃত্যুই বুঝি চরম মুক্তি। সমুদ্রের ঢেউ আর লোনা নীল জলের ছায়া একদিন তার মনকে বিষাক্ত করে তুললো। সে-সময় আবার সুরু হয়েছে ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন। ইংরেজের শোষণের বিরুদ্ধে গণজাগরণ।

নেতৃবৃন্দের আহ্বানে দেশবাসী সেদিন সর্বস্বত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই সংগ্রামে। দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনের জন্য সে দিন যারা আত্মাহুতি দিয়েছিল, নবারুণ তাদের মধ্যে একজন। বাঙলার মাটির আকর্ষণে সেদিন সে বিদেশী প্রভুর অধীনস্থ উচ্চপদ ত্যাগ ক'রে সরাসরি যোগদান করলো গণ-আন্দোলনে, যার ফলে তার জীবনের তিনটি বছর কেটে যায় কারাভ্যন্তরে।

জেল থেকে ফিরে এসে নবারুণ দেখা করে মনীষার বাবা জীবানন্দ মৈত্রের সঙ্গে। জীবানন্দ বাবু কিন্তু তাকে মোটে আমল দেননি। নবারুণ আশা করেছিল, মনীষার বাবা রায়সাহেব জীবানন্দ মৈত্র তাকে এই সময় অন্তত সাহায্য করবেন। একটা যে কোন চাকরি সে সময় তিনি অনায়াসেই ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন। টেলিফোনে যাকেই তিনি অনুরোধ করতেন, সে নিশ্চয়ই একটা চাকরির সংস্থান করে দিত। কিন্তু রায়সাহেব জীবানন্দ বাবু দেশপ্রেমিকদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেছিলেন। ঠিক এস, বি বা আই, বি'র জন্য নয়—রায়সাহেব জীবানন্দর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য; নববর্ষে একটা জাঁদরেল খেতাব পাবার লোভে। উপরন্তু, ছেলে শশাঙ্ক ও মেয়ে মনীষাকে পর্যন্ত নবারুণের সঙ্গে মেলামেশা করতে তিনি বারণ করে দিয়েছিলেন। মনীষা তার বাবার অসাক্ষাতে অবশ্য নবারুণের সঙ্গে দেখা করতো। জীবানন্দবাবুর পক্ষে নবারুণকে এড়িয়ে চলা যতটা সহজ ছিল, মনীষার পক্ষে ঠিক ততটা সহজ ছিল না। তার কারণ একই স্কুলে মনীষা ও নবারুণ শিক্ষালাভ করেছিল। কৈশোরের

সীমান্তে এসে নবারুণ খুব আপন করে পেয়েছিল মনীষাকে। ঠিক সেই সময় থেকে এদের দুজনের মধ্যে এমনি এক নিগূঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে, তারা পরস্পরে একজন অপরজনকে দূরে রেখে সন্তুষ্ট থাকতে পারত না।

যৌবনের প্রারম্ভে, মনীষা নবারুণকে পেয়েছিল তার জীবনের প্রথম পুরুষ হিসেবে। সে মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিল ছোট্ট একটি নীড়—যেখানে থাকবে সে আর নবারুণ। কত মান-অভিমানের মধ্যে তাদের এক একটি দিন কেটেছে। নবারুণও মনীষাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসত। এই তো এদের জীবনের প্রথম প্রেম। গভীর অনুরাগে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাদের সে গভীরতার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল—তাদেরই পরবর্তী জীবনে।

বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে নবারুণ ও মনীষা একদিন খুব ভোরে গীর্জে গিয়ে শপথ করেছিল। মনে মনে এই সঙ্কল্প করেছিল যে, তারা কেউ কারুকেই কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। মনীষা নবারুণের জন্য অপেক্ষা করবে—। নবারুণ তার প্রতিশ্রুতি কোনোদিনই ভঙ্গ করেনি। বিদেশে থাকাকালে সে প্রতি সপ্তাহে একটি করে চিঠি দিত মনীষার কাছে, যার উত্তরে মনীষা নবারুণকে জানিয়েছে তার দুঃসহ জীবনের বেদনাময় কাহিনী। এরপর বহু ঘটনাই ঘটে গেছে। বহু বিরহ-মিলনের ইতিকথা রচনা করা যায় এদের জীবনের এক একটি কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে। কিন্তু জেল থেকে ফিরে নবারুণ যখন জীবানন্দ-

বাবুর কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্য পেল না—তখন সে প্রথমটা খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল। শেষে বহু খোঁজাখুঁজি করে নবারুণ এ, এন, মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানী নামে একটি ষ্টিভেডোরের অফিসে অফিস এ্যাসিস্টেণ্টের চাকরি যোগাড় করে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার জন্যই অবশ্য তার এ চাকরি হয়েছিল। তবে মাইনে খুব বেশী নয়। তবু এই বাঙালী প্রতিষ্ঠান নবারুণকে যে মাইনের বরাদ্দ করে দিয়েছিল, তা তার একলার পক্ষে যথেষ্ট। যথেষ্ট অর্থে, নবারুণের নিজের মাসিক খরচটা তাতে কোনোরকমে চলে যায় আর কী।

চাকরি পাওয়ার কিছুদিন পরে—মনীষা নবারুণকে জানালে: আমি এবার চলে আসতে চাই। আর কতদিন এইভাবে থাকা যায় বলতো?

নবারুণ তার উত্তরে বলেছিল: আমার এই চাকরির ভরসায় এখন বিয়ে করা যায় না। কয়েকটা মাস অপেক্ষা করো। তারপর আমি সব ব্যবস্থা করবো।

—নবারুণ, তুমি চিরদিন তোমার দিকটাই দেখে এসেছ। এইভাবে আমার আর বাড়ীতে থাকা সম্ভব নয়। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে—এ কথাটা আমার বাবা মা ছাড়া আর সকলেই জানে। সকলের কটাক্ষ সহ্য ক'রে আর কিছুতেই বাড়ীতে থাকা যায় না।

—লক্ষ্মীটি, আর কয়েকটা মাস অপেক্ষা করো। আমি একটু গুছিয়ে নিই, তারপর·····, বলেছিল নবারুণ।

কিন্তু মনীষা নবারুণের সে কথায় কোনো গুরুত্ব দেয়নি। তার মনে হয়েছিল নবারুণ তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। রাগে, ক্ষোভে সে বলেছিল: নবারুণ, আমি এ জানতুম। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ—এ জীবনে আমিও যেমন সুখী হবো না, তেমনি তুমিও সুখী হবে না। তোমার এ স্তোক বাক্য আমি বহু দিন ধরে শুনে আসছি, আর নয়। এবার আমায় বিদায় দাও।

মনীষার এই কথায় নবারুণ সেদিন কোনো উত্তরই দেয়নি। দেয়নি তার কারণ—সে আশা করেছিল একদিন মনীষার এ ভুল ভেঙ্গে যাবে। তাদের কৈশোরের স্বপ্ন—সে একদিন নিশ্চয় সার্থক করে তুলবে।

বিধাতা পুরুষ হয়তো সেদিন অলক্ষ্যে হেসেছিলেন।

এর কিছুদিন পরে নবারুণ গিয়েছিল মনীষায় বাড়ী শশাঙ্কর সঙ্গে দেখা করতে। শশাঙ্ক নবারুণকে বহু দিন পর দেখে বেশ খুশি হয়েছিল। কিন্তু মনীষা সেদিন দেখা করলো না নবারুণের সঙ্গে। কেন দেখা করলো না—প্রথমে তার কোনো সঠিক কারণ বুঝে উঠতে পারেনি নবারুণ। পরে অবশ্য সে তা আবিষ্কার করেছিল। একটু আলাপের পর শশাঙ্ক একটি হলুদ রঙের ছাপা নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে নবারুণকে বলেছিল: আগামী বুধবার মনীষার বিয়ে। তোমার কিন্তু আসা চাই নবারুণ। মনীষা গেছে মার্কেটে তার কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে। তার হ'য়ে—আর আমার পক্ষ থেকে তোমাকে নিমন্ত্রণ জানালাম।

নবারুণ একটু মৃদু হেসে বলেছিল : নিশ্চয় আসবো। মনীষার বিয়ে আর তোমার নিমন্ত্রণ—দুটিই আমার কাছে খুব লোভনীয়।

শশাঙ্ক আরো বলেছিল : ছেলেটি তোমার পরিচিত নবারুণ।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। তোমাদের সেই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অমিয় লাহেড়ী। ছেলেটি খুব ভালো। মার খুব পছন্দ হ'য়েছে ব'লে আমরা সকলেই মত দিলাম। সচ্চরিত্র ও বাপের বেশ প্রচুর টাকা আছে। নবারুণের কাছে এ খবরই যথেষ্ট। সে আর বেশী কথা না বলে শশাঙ্কর কাছ থেকে সেদিন বিদায় নিয়েছিল।

মনীষা তো তাকে কিছু বললো না। এ কথাটা অবশ্য বার বার মনে হ'য়েছিল নবারুণের। কিন্তু, সে নিজেই যেন খুব বেশী লজ্জাবোধ করছিল মনীষার সঙ্গে দেখা করতে। দেখা সে করেনি। বহুদিন ধরে সে নিজেকে বহু সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। নবারুণ মনীষার বিয়ে হওয়ার জন্য খুবই আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু কোথাও সে তা প্রকাশ করেনি। মনে হয়েছিল তার,—জীবনের বুঝি কোনো মূল্য নেই। কয়েকদিন আর পাঁচজনের মতো তারও মনে হয়েছিল, বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই। দেহের ক্ষত যত সহজে নিরাময় হয়, মনের ক্ষত কিন্তু তত সহজে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই সারে না। কিছুদিন নবারুণের মনটা খুব মুষড়ে থাকে। মনীষার কথা মনে পড়লে মনটা তার

অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়।

শেষে সে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে মনীষাকে ভোলার চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে মেসার্স এ, এন, মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী অবনী মুখার্জি নবারুণের কাজে ঐকান্তিকতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। নবারুণের প্রতি তাঁর ক্রমে ক্রমে যেন বিশ্বাস বেড়ে যেতে লাগল। তা ছাড়া মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য নবারুণের কদরও যেন আরও একটু বেশী বেড়ে গেল। অবনীবাবু এবার নতুন কাজ করতে লাগলেন। বিলিতী কোম্পানীগুলোর কাছে সরাসরি কনট্রাক্ট করতে লাগলেন। তাদের জাহাজের রেডিও ওয়ার্লেস থেকে আরম্ভ ক'রে সব কিছুই সরবরাহ ও মেরামতের কাজ করতে লাগলেন। এদিকে নবারুণ চক্রবর্তী মেসার্স এ, এন, মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানীর সর্বেসর্বা হয়ে উঠলো। নবারুণের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য কোম্পানী যখন প্রচুর মুনাফা করতে লাগল—তখন একদিন অবনীবাবু নবারুণকে সস্নেহে ডেকে বললেন: তোমাকে আজ আমি একটা কথা বলবো বাবা। তুমি কথা দাও আমার সে কথা রাখবে?

অবনীবাবুর বয়স নবারুণের চেয়ে ঢের বেশী। তাই হঠাৎ এই ভাবে তুমি ব'লে সম্বোধন করায় নবারুণ যত না বিস্মিত হয়েছিল—তার চেয়ে বেশী বিস্মিত হয়েছিল অবনীবাবুর প্রতিশ্রুতি আদায়ের অভিনব কৌশল দেখে।

কিন্তু নবারুণ ভেবেই পায় না—অবনীবাবু কী এমন সংকটের

সম্মুখীন হলেন যে তাকে এইভাবে জিগ্‌গেস করছেন।

একটু ইতস্ততঃ করেছিল নবারুণ। কিন্তু অগত্যা সে রাজী হ'য়ে গিয়েছিল। স্পষ্ট করে সে জানিয়ে দিয়েছিল, অবনীবাবুর যে কোনো অনুরোধকে সে উপযুক্ত মর্যাদা দেবে। অবনীবাবু তাঁর এতদিনকার সঞ্চিত বাসনা সেদিন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন নবারুণকে।

অবনীবাবুর একমাত্র মেয়ে অচিরা—তাকে বিয়ে করতে হবে। নবারুণ অচিরাকে শুধু এই একই কারণে বিয়ে করেনি, তার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল প্রচ্ছন্ন। সে উদ্দেশ্য হ'চ্ছে—মনীষাকে ঈর্ষান্বিত করা। একদিকে ঐশ্বর্য, অপরদিকে সুন্দরী, শিক্ষিতা স্ত্রী। নবারুণ মনে মনে খুশিই হয়েছিল অচিরাকে বিয়ে ক'রে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মনীষা কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না তাদের এই বিয়ে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে মেসার্স এ, এন, মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানীর নবারুণ হবে উত্তারাধিকারী। সত্যি সত্যিই তাই হয়েছিল। অবনী মুখার্জির মৃত্যুর পর নবারুণ চক্রবর্তী হয় একমাত্র স্বত্বাধিকারী। অবশ্য তা হয়েছিল, অচিরাকে বিয়ে করার প্রায় তিন বছর পরে।

॥ তিন ॥

নবারুণের ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ছকু এসে চায়ের ট্রে ও খবরের কাগজ দিয়ে যায়। এটা হ'চ্ছে তার দৈনন্দিনের প্রাতঃকালীন কার্য-সূচীর অন্যতম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাসি মুখে চা পান করার বেশ একটা আমেজ লাগে। এটা নবারুণের বহু দিনের অভ্যাস। নবারুণ চা-এর পেয়ালায় চিনি দিয়ে নাড়তে নাড়তে অচিরাকে ডাকে ঃ শুনছো—চা দিয়ে গেছে। অচিরা···অচিরা? চা দিয়ে গেছে, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

নবারুণের ডাকে অচিরার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুমে তার আড়ষ্ট চোখ। হাতের তালু দিয়ে চোখ দুটি রগড়ে নিয়ে তাকায় নবারুণের দিকে। একটু মৃদু হেসে বলে ঃ আরো একটু ঘুমোতে পারলে ভাল হোতো। চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে।

নবারুণ বলে ঃ ঘুমোও। আমি চায়ের জন্য ডাকছিলুম।

—না। ব'লে অচিরা বিছানার উপর উঠে বসলো। নবারুণ চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দেয় অচিরার দিকে। অচিরা তার বাঁ হাতের তালুর ওপর পেয়ালাটা রেখে চুমুক দেয় আর বলে ঃ তোমার তৈরী চা সত্যি খুব ভাল।

নবারুণ কেট্‌লির ঢাকনাটা একটু তুলে দেখে বলে ঃ আর এক পেয়ালা হবে। তুমি শেষ করো—আমি আবার তৈরী করে দিচ্ছি।

অচিরা বলে ঃ ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমায়।

নবারুণ খবরের কাগজের পাতায় মন দিয়ে দেখে নেয় প্রধান প্রধান খবরগুলো। অচিরাও দু' পেয়ালা চা শেষ ক'রে তার ঘুমের আমেজ কাটায়। অনেকক্ষণ দু'জনে চুপচাপ থাকে। তারপর নবারুণই প্রথম কথাটা তোলে ঃ কাল কখন ফিরলে ?

বেশী রাত হয়নি। রাত্রি সাড়ে এগারোটা, তুমি তো তখন ঘুমে অচেতন।

ডাকলেই পারতে, বলে নবারুণ।

—না, ডাকলাম না। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘুমিয়েছ—ডাকতে সাহস পেলাম না।

অচিরা আবার বলে ঃ মিলি ও মিলির মা তোমার কথা জিগ্‌গেস করছিল।

তুমি কি বললে ?

—আমি বললাম, তোমার অনেক কাজ। এক মুহূর্ত স্বস্তি নেই। আবার নতুন কয়েকটা জাহাজ এসেছে কোলকাতার বন্দরে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু মিলি এসব মেনে নিলেও মিলির মা বললেন, তা হ'লেও সময় ক'রে একটু আসা উচিত ছিল।

নবারুণ বললে ঃ আর কে কি বললে ?

অচিরা বুকের কাছে একটা বালিস টেনে নিয়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে শুয়ে বলতে লাগল ঃ আরো সব অনেকে জিগ্‌গেস করছিল তোমার কথা। সাধনা, লতিকা, অরুণা গুহ, তারপর আমাদের সেই দীপ্তি ঘোষ, বন্দনারাও দু' বোনে এসেছিল। বহু টাকা

খরচ করেছে মিলির মা।

নবারুণ সব শুনে শেষে বললে: আগে আমার পার্টিতে যেতে ভাল লাগতো, কিন্তু আজকাল কেন জানিনা মোটেই ভাল লাগে না। আর তা ছাড়া সময়েরও খুব অভাব।

অচিরা বলে: সময় তুমি ইচ্ছে করলেই করতে পার। অচিরা এবার উঠে এসে বসে নবারুণের বিছানায়। নবারুণ কাগজের ওপর নজর রাখতে রাখতে বলে: না গো না। সত্যি সময় হয় না।

অচিরা নবারুণের হাত থেকে খবরের কাগজটা নিয়ে ভাঁজ করে রেখে দেয় টেবিলের ওপর। তারপর বলে: দেখ,—ইচ্ছে করলে তুমি অনেক সময় করতে পারো। আমার বাবা আর কাজ করতো না—না?

—তোমার বাবা করতেন, কিন্তু আমার মতো তখন তাঁর এত কাজই ছিল না। আমার কত কাজ বলতো? আজ এখানে, কাল ওখানে। আজ অমুক সিপ্ মাষ্টারকে কোলকাতা ঘুরিয়ে দেখানো, ইত্যাদি। কত রকমের কাজ। তবেই না মেসার্স এ, এন, মুখার্জি এ্যাণ্ড কোম্পানী আজ ভারতবর্ষে সব চেয়ে বড়ো ষ্টীভেডোর?

—তোমার পয়সার নেশা আজকাল খুব বেড়েছে, ব'লে অচিরা খুব ভাল করে লক্ষ্য করে নবারুণকে, এই কথায় নবারুণের মুখে চোখের কোনো পরিবর্তন হয় কী না।

নবারুণ কথাটিকে অত্যন্ত সহজ করে নিয়ে বলে: তমিই

তো তার উৎস।

এ কথাটা অচিরার মোটেই ভাল লাগে না। কোথায় যেন সে আঘাত পায়। বলে: না···না। আমি তোমার কিছুরই উৎস নই। বিয়ে করে লোকে যৌতুক পায়। আমি তো তোমার কাছে যৌতুকের সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নই। অচিরার কণ্ঠস্বর যেন হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে।

নবারুণ অচিরার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয়। একটু মৃদু চাপ দিয়ে সে বলে: এ তোমার মিছে অভিমান অচিরা।

অচিরা বলে: আচ্ছা, তুমি একটা সত্যি কথা বলবে?

—কি কথা? বলার মত হ'লে নিশ্চয়ই বলবো।

অচিরা চুপ করে থাকে। কী যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সে সামলে নেয়।

নবারুণ বলে: চুপ করে গেলে কেন? বলো।

—আমাকে বিয়ে করে তুমি বোধ হয় সুখী হওনি, না?

—আজ হঠাৎ তোমার মনে এ কথা উঠলো কেন?

—বলো না, আমি লক্ষ্য করেছি। প্রথম প্রথম তোমার কাছে যা আমি পেয়েছি—আজকাল আর তা পাই না। তুমি তোমার পথে চলো—আমি চলি আমার পথে। তুমি আমায় ঘৃণাও করো না, আবার ভালও বাসো না। দিন দিন তোমার ব্যবহার আমার সন্দেহের কারণ হ'য়ে উঠেছে। আজ তোমায় বলতে হবে। কেন তুমি আমাকে কোনো কিছু বলো না?

আচ্ছা, তুমি তো আমাকে বকতেও পার? ভাল না বাসলে, বকলেও অন্তত বোঝা যায় তোমার আন্তরিকতা আছে। বলো—আজ তোমায় এ জবাব দিতে হবে।

এই কথা বলে অচিরা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। অভিমানে, ক্ষোভে ও লজ্জায় অচিরা নিজের মুখ লুকিয়ে ফেলে নবারুণের কোলে। নবারুণ এই ধরনের প্রশ্নের জন্য যেন প্রস্তুত ছিল না। সব কিছু যেন তার গোলমাল হয়ে যায়। ধীরে ধীরে অচিরার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় নবারুণ। আর সান্ত্বনা দিয়ে সে বলে: এ তোমার আজ কি হলো বলতো? চুপ করো লক্ষ্মীটি, দিন দিন তুমি ছেলেমানুষ হ'য়ে যাচ্ছ।

অচিরার চোখের জল যেন কোনো বাঁধ মানে না। এতদিনের সঞ্চিত যে বোঝা—তা সে এই মুহূর্তেই উজাড় করে দিতে চায়। কান্না মানুষের মনকে একটু হাল্কি করে দেয়। তাই অনেকদিন ধরে অচিরার মন যে দুঃখে ভারী হয়েছিল—আজ তার চোখের জলে তা কিছুটা বোধ হয় হাল্কি হ'য়ে গেল।

নবারুণ বলে: তুমি একটা খুব ভুল ধারণা করে নিয়ে—আজ এত দুঃখ পাচ্ছ। পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য যেমন সত্যি, তেমনি তোমার আমার বিয়েও সত্যি। আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে বলছি, আমি সুখী। খুব সুখী।

অচিরা কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে ফেলে। নবারুণের হাত দুটি ধরে বলে: আমার একটা মিনতি আছে তোমার কাছে।

তুমি আর যাই করো—আমাকে কোনোদিন অবহেলা কোর না। জান তো আমি সব সহ্য করতে পারি, শুধু পারি না কারুর অবহেলা সহ্য করতে।

সেদিনের সকাল বেলাটা ওদের এইভাবে কেটে যায়। ওদের কথার মাঝে এসে উপস্থিত হয় ট্যাবি। ট্যাবি অচিরাকে দেখলে খুশিতে যেন ফুলে ওঠে। ট্যাবিকে নিয়ে সুরু হয় ওদের নানান কথা।

সন্ধ্যাবেলা অচিরা কোথাও বাইরে যায়নি। নবারুণ এসে অচিরাকে নিয়ে বার হয় বেড়াতে। মোটরে ক'রে কলকাতার আশে পাশে, গঙ্গার ধার ধরে খানিকটা বেড়িয়ে আসায় অচিরার মনের গুমোট ভাবটা কেটে যায়। তবু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়—অচিরা ও নবারুণের মধ্যে কোথায় যেন একটু ফাটল ধরে আছে। নবারুণ তা জানে—কিন্তু অচিরা সে বিষয়ে কিছু জানে না। দিনের মধ্যে খানিকটা সময় স্বামীকে একান্ত করে না পেলে যে কোনো স্ত্রীরই মনে ক্ষোভ হয়। অচিরারও যে হবে—তাতে আর আশ্চর্য কি? প্রচুর অবসর ও প্রয়োজন মত স্বামীকে না পাওয়ার জন্যই, অচিরা নিজেকে ব্যস্ত রাখে,—সমাজসেবা, পার্টি, ক্লাব নিয়েই দিন কাটায়। নবারুণ অচিরাকে বিয়ে করেছে অবনী মুখার্জির অনুরোধে—আর মনীষাকে ঈর্ষান্বিত করার জন্য। কিন্তু বেচারী অচিরাতো তা জানে না, তাই সে মাঝে মাঝে স্ত্রীর দাবী নিয়ে হাজির হয় নবারুণের কাছে।

॥ চার ॥

সেদিন বোধ হয় বুধবার হবে। নবারুণ ঠিক বেলা দশটার সময় এসে হাজির হয়েছে অফিসে। কাজের চাপ এ কদিন একটু বেশীই পড়েছে। মেসার্স এ, এন মুখার্জি এণ্ড কোম্পানীর কাজ বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে ওয়ার্লেস এঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট।

পুরোনো অফিস—যেমনটি অবনী মুখার্জি সাজিয়ে গেছলেন ঠিক তেমনটিই নবারুণ রেখে দিয়েছে। বন্ধুরা—অনেকেই বলেছে, নতুন আসবাবপত্র দিয়ে অফিস সাজাতে। নবারুণ তাদের কথায় কোনোদিন কান দেয়নি। মনে মনে শুধু বলেছে, পুরোনো আসবাব ও পুরোনো অফিসের কদর কে বোঝে! এতে বনেদীয়ানার একটা ছাপ আছে। ঘণ্টা মেরে নবারুণ নতুন ডাক খুলে পড়ছে। বেয়ারা এসে দাঁড়ায় সামনে।

নবারুণ বলে ঃ ঘোষবাবুকে ডেকে দাও।

ঘোষবাবুর আসল নাম কমলাকান্ত ঘোষ। কয়েকটা চিঠিতে লাল পেন্সিল দিয়ে ডিপার্টমেণ্ট মার্ক ক'রে পাশের ঝুড়িতে রাখছে। ঘোষবাবু এসে হাজির হয় নবারুণের সামনে। ঘোষবাবু বলে ঃ গুড মর্নিং স্যার। নবারুণ চিঠি পড়তে পড়তেই বলে ঃ মর্নিং।

ঘোষবাবু পার্চেসিং ডিপার্টমেণ্টর সর্বেসর্বা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে টেবিলের সামনে।

হাতের চিঠিটা পড়া শেষ ক'রে নবারুণ ঘোষবাবুর দিকে

মুখ তুলে বলে : এস্, এস্, 'জলজহর' ও এস্, এস্ 'সিটি অফ চার্চিল' কালই কোলকাতা ছেড়ে চলে যাবে। আজ মুরিং আছে। আপনি একশো দশ ভোল্টের ব্যাটারি, ল্যাম্পস্ ও সুইচগুলো বাজার থেকে কিনে সাপ্লাই করে দিন, আর 'সিটি অফ চার্চিলের' ক্যাপ্টেনের পার্সোনাল নামে এক কেস বীয়ার ও দু' বোতল স্কচ্ হুইস্কি দেবেন। আর, আমাদের চীৎপুর গুদোম থেকে তিনটে রেক্‌টিফায়ার ভ্যালভ আজই তিনটের মধ্যে পাঠানো চাই। এই নিন লিষ্ট। এতে ভ্যালভের নম্বর দেওয়া আছে, ব'লে একটা কাগজ ঘোষবাবুর হাতে দিয়ে দিল। ঘোষবাবু চলে গেল কাগজ নিয়ে। ক্যাসিয়ার এবার এসে হাজির।

কয়েকটা ভাউচার কাল থেকে পড়ে আছে স্যার। দয়া করে সই করে দিন। ক্যাশ বই পোষ্টিং বাকি আছে। এই ব'লে ক্যাশিয়ার ভাউচারগুলো নবারুণের সামনে রেখে দিয়ে চলে আসছিল।

নবারুণ বললে : দাঁড়ান ক্যাশিয়ারবাবু।

ক্যাশিয়ার দাঁড়িয়ে যায় টেবিলের সামনে।

নবারুণ ক্যাশ ভাউচারগুলো সই করতে করতে হঠাৎ একটা ভাউচার ধরে বলে : এ কি করেছেন ?

ক্যাসিয়ার বিস্মিত হয়ে বলে : কেন স্যার ?

—একাউন্টস্ হেডিং তো ঠিক হয়নি। জেনারেল এক্সপেন্সে ডেবিট হবে না। এটা বদলে ট্রাভলিং-এ ডেবিট করে দিন। আর এই তিনশো কুড়ি টাকার ভাউচারটা সাণ্ডি একাউন্টসে

ডেবিট হবে।

ক্যাশিয়ার ভাউচার দুটি হাতে করে নিয়ে বলেঃ আমার ভুল হ'য়ে গেছে স্যার। আমি বদলে ঠিক করে দিচ্ছি এখুনি। ক্যাশিয়ার নবারুণের সই করা অন্য ভাউচারগুলো নিয়ে চলে যায়।

এর মধ্যে আবার টেলিফোন আসে নবারুণের। রিসিভারটা তুলে নিয়ে কথা সুরু করে দেয়। ফোন এসেছে রঙের কারখানা থেকে। 'ব্যাটল্ সিপ্ গ্রে'-রঙ সরবরাহ করতে পারবে না। নবারুণ খুব ধমক দিয়ে বলে, তা হবে না। যে কোরেই হোক অন্ততঃ কুড়ি গ্যালন দিতেই হবে। তা না হ'লে সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে কী কথা হয়—তা বোঝা যায় না। তবে একটা কিছু ঠিক ঠাক হ'য়ে গেছে নিশ্চয়। সেটা অবশ্য নবারুণের মুখ দেখে অনুমান করা যায়।

এক মিনিট স্বস্তি নেই নবারুণের। একটার পর একটা কাজ। এমনি করে তার সপ্তাহে ছ'টি দিনই কাটে। এত বড়ো অফিসের সকল দায়িত্ব তার। লাভ লোকসানের সবটাই যেমন নবারুণের, তেমনি সকলের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করতে হয় তাকে।

চিঠির বাণ্ডিলের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত চিঠি আসে নবারুণের নামে। খামের ওপরটি কাগজ কাটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে—চিঠিটা খুলে পড়তে সুরু করে সে—

"প্রিয়বরেষু,

তোমাকে আজ আবার চিঠি লিখছি। জানি না তুমি এর উত্তর দেবে কী না। আগামী ১৭ই এপ্রিল আমার চিত্র প্রদর্শনী সুরু হবে। তোমাকে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তুমি অবসর পেলে আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। কোলকাতা ছাড়ার পর এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে আমাদের বোধ হয় ভুলে গেছ। মনীষারও ইচ্ছে—তুমি কদিন এখানে এসে ঘুরে যাও। সমুদ্র তুমি অনেক দেখেছ, কিন্তু এই সময় বঙ্গোপসাগরের রূপ দেখার মত।

ক'দিন এখানে এসে সকলে মিলে আনন্দ করার মতলব করেছি। তোমাকে পেলে আমাদের সকলের আনন্দে কাটবে বলে মনে হয়। মনীষা বলে, তুমি এখন কোটিপতি হ'য়েছ। আমাদের অনুরোধ রাখা তোমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তবু তোমায় আসার জন্য অনুরোধ করছি।

আশা করি তোমার সব কুশল।

আমার প্রীতি নিও। ইতি—

তোমাদের

অমিয় লাহিড়ী"

পুরী থেকে চিঠি লিখেছে অমিয় লাহিড়ী। মনীষা তার স্বামীকে দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছে। নবারুণের মনটা ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়। পুরোনো দিনের কয়েকটি স্মৃতি তার মনে পড়ে।

মনীষার বিয়ের প্রায় তিন বছর পরে, হঠাৎ একদিন নবারুণের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। মার্কেট থেকে কয়েকটি বই আর পারফিউমারি কিনে সে ফিরছিল। একা নবারুণকে সামনাসামনি দেখে বলেছিল ঃ কেমন আছ ?

নবারুণ সংক্ষেপে বলেছিল ঃ ভাল।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আলাপ করাটা খুব শোভন নয় ব'লে নবারুণ মনীষাকে বলেছিল ঃ এসো, লাইটহাউস ব্র্যাসারিতে বসে সফ্‌ট্ ড্রিঙ্ক করি। অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে তোমার।

আপত্তি করার কোন কারণ ছিল না। নবারুণ ও মনীষা লাইটহাউসের ব্র্যাসারিতে গিয়ে মুখোমুখি বসেছিল একটা চৌকো টেবিলে। দু' গ্লাস অরেঞ্জ ক্রাশ্ সামনে রেখে দু'জনের কেউই সেদিন ভাল করে কথা বলতে পারেনি। শুধু উঠে আসার সময় নবারুণ তাকে জিগ্‌গেস করেছিল ঃ এ বিয়েতে তোমার সম্মতি ছিল ?

মনীষা তার উত্তরে বলেছিল ঃ আমার সম্মতির ওপর এ বিয়ে হয়নি।

—সে কি ? খুব বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করেছিল নবারুণ।

—তবে কার আদেশে ?

—মা, বাবা।

—তুমি আপত্তি জানালে না কেন ?

—কার ভরসায় ? তা ছাড়া আমার মা বাবা খুব অবিবেচক নন। তাঁদের অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশী।

পথে এসে সেদিন দু'জনে দু'দিকে চলে গিয়েছিল।

এরপরে বার কয়েক দেখা হ'য়েছিল মনীষার সঙ্গে নবারুণের। মনীষা কোনো বারেই একা ছিল না। সব বারেই অমিয় লাহেড়ী ছিল সঙ্গে। স্বামীর সামনেই মনীষা নবারুণকে নিমন্ত্রণ ক'রেছিল তার বাড়ীতে আসার জন্য।

অমিয়কে দেখে নবারুণের অবশ্য তখন আর ঈর্ষা হতো না। একরকম সহ্য হয়ে গেছল তাকে। কিন্তু যে কেনো কারণেই হোক, তার মনীষার বাড়ীতে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

এবারে কিন্তু নবারুণ যাবে বলে মনে মনে স্থির করে ফেলে। একটু অবসর তার চাই। অবসর না নিলে মন আর শরীর কিছুই ঠিক থাকবে না। তা ছাড়া বেশী দূর তো নয়। এই তো বাংলার সীমানা ছাড়লেই পুরী। সমুদ্রের তীরে শুয়ে আকাশ দেখে অন্তত কয়েকটা দিন ভাল যাবে।

নবারুণ ঘণ্টা বাজায়। বেয়ারা এসে হাজির হ'তে তাকে হুকুম করে রামপদবাবুকে ডেকে দিতে। রামপদ, অবনী মুখার্জির আমলের লোক। কালো—শুকনো চেহারা। এত বয়সেও গাল ব্রণতে ক্ষত-বিক্ষত। বিশ্বাসী খুব, কিন্তু হিংসুটে ধরনের। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় লাগালাগি করা যেন তার জন্মগত অভ্যাস। তা যাই হোক নবারুণকে সমীহ করে চলে। নবারুণের সামনে এসে দাঁড়ায় রামপদ।

নবারুণ জিগ্‌গেস করে: ই, পি, টি, ও ট্রায়াল ব্যালেন্স টানা হ'য়েছে আপনার?

—না স্যার, বলে রামপদ।

—কেন? মার্চে আপনাদের একাউন্টস ক্লোজিং হয়। তারপর আজ কতদিন হয়ে গেল, এখনও হয়নি?

—আর দু'দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। আমাকে দুটো দিন সময় দিন স্যার।

দু'দিন টু দিন বুঝি না। আজই আপনাকে শেষ করে যেতে হবে। এতদিন করলেন কি?

খুব নম্রভাবে রামপদ বলে: জেনারেল লেজার যে মেলেনি স্যার।

—মিলবে আর কি করে বলুন? শুনেছি আপনি অফিসে বসে নভেল লেখেন। অফিসের কাজ ক্ষতি করে···। মৃদু প্রতিবাদ জানায় রামপদ। বলে: না স্যার, অফিসে আমি লিখি না।

নবারুণ রাগত হয়ে বললে: সেটা আপনার ধর্ম। আপনি কর্তার আমলের লোক, তা ছাড়া বয়সে আপনি প্রবীণ। সব কিছু আপনাদের বলা যায় না। যাক্‌গে, দয়া করে আজকের রাত্রির মধ্যে শেষ করে ফেলুন। কালই আমি একটু বাইরে যাবো। নভেল না লিখে যদি অফিসের কাজে মন দেন—তাতে আপনার ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল। আর তা ছাড়া লেখাও তো ব্রেন ওয়ার্ক। এত বেশী ব্রেন ওয়ার্ক করলে যে ব্লাডপ্রেসার বাড়বে। রামপদ বলে: আমি স্যার সিরিয়াসলি লিখি না। নানা রকম ফন্দি এঁটে লিখি। তবে অফিসের কাজ ফাঁকি দিয়ে কখনই লিখি না।

কর্তার আমলের লোক বলে রামপদর জবাব দিতে ভয় হয় না।

নবারুণের সহজে বড় রাগ হয় না। আর তা ছাড়া রাগতে তাকে কেউই দেখেনি বললে হয়। তবু এই মুহূর্তে যেন তার কণ্ঠস্বর আরো কর্কশ শোনায়। নবারুণ বলে: যান—যান তাড়াতাড়ি গিয়ে শেষ করুন।

রামপদ আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে চলে যায়। নবারুণের কথাগুলো তার খুব বেশী মনে লেগেছে। কান দুটো লাল হ'য়ে ওঠে। রাগে তার সারা শরীরটা কাঁপতে থাকে।

রামপদ বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবারুণ নিজের মনে মনে বলে ওঠে: যেমন চেহারা, তেমনি নির্বোধ। এত বয়স হ'য়েছে—তবু যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকতো মগজে।

বেয়ারা এসে কয়েকটা ফাইল রেখে যায় টেবিলে। নবারুণ তাকে লক্ষ্য করে বলে: সুধাংশু বাবুকে ডেকে দাও।

কিছুক্ষণ পরে সুধাংশু বাবু এসে হাজির। সুধাংশু বাবুর ওপর নবারুণের আস্থা আছে। তা ছাড়া এই লোকটির ওপর কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

নবারুণ বলে: আমি মাসখানেকের জন্য বাইরে যাবো বলে মনস্থ করেছি। এই কদিনের জন্য যদি আপনি অফিসের সব কাজের ভার নেন—তা হ'লে আমার যাওয়া সম্ভব হয়।

সুধাংশু বাবু উচ্চশিক্ষিত ও অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির ব্যক্তি। একটুখানি হেসে বললেন: আপনি যদি আমার ওপর কোনো

দায়িত্ব দেন, তা নিশ্চয়ই আমি আমার সাধ্যমত পালন করবো। সেখানে আমার কাজে এতটুকু অবহেলা দেখতে পাবেন না।

নবারুণ পেপার ওয়েটটা হাতে করে নিয়ে লুফতে লুফতে বলে : সেই বিশ্বাস আছে বলেই তো আপনাকে বলছি। জানেন সুধাংশু বাবু—মনিব সেজে বসে থাকলে কখনো ব্যবসা করা যায় না। ব্যবসা করতে গেলে নিজেকে যেমন পরিশ্রম করতে হয়, তেমনি লোকজনদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে জানতে হয়। কাজের মধ্যে দিয়ে মনিব ও কর্মচারীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানিবন করতে গিয়েই বাঙালীদের ব্যবসা লাটে উঠে যায়। দেখেছেন তো অবাঙালী ব্যবসায়ীরা কত পরিশ্রম করে। আরে মশাই টাকা থাকলেই ব্যবসা করা যায় না। টাকার সঙ্গে চাই বুদ্ধি! টাকা তো যে কোনো লোক ইনভেষ্ট করতে পারে, কিন্তু ইনভেষ্ট করে ক'জনে টাকা তুলে নিতে পারে? এসব অবশ্য আমার কথা নয়। এসব অবনীবাবুর কথা। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি তিলে তিলে তাঁর রক্ত দিয়েছিলেন বলেই—আজ আমাদের কোম্পানীর অস্তিত্ব রয়েছে।

সুধাংশু বাবু বলেন : আপনি কবে যাবেন?

—ধরুন যদি কালই যাই।

—কাল যাবেন আপনি। তাতে আর কী হ'য়েছে। তবে চার্জ বুঝিয়ে না দিয়ে গেলে আমাকে একটু অসুবিধায় পড়তে হবে—এই আর কী!

নবারুণ বলে : নিশ্চয়, নিশ্চয়। চার্জ তো আপনাকে বুঝিয়ে

দেবই। তা ছাড়া আরো কয়েকটা স্পেশাল ইনস্ট্রাক্শন দেবার আছে। আপনি একটু বসুন—আমি এখুনি আপনাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

নবারুণের নির্দেশ মত সুধাংশুবাবু সামনের চেয়ারে বসে পড়েন। নবারুণ একের পর একটি কাগজ দিয়ে বুঝিয়ে দেয়। কার টেণ্ডার দিতে হবে, বকেয়া বিলের জন্য কাদের তাগাদা করতে হবে। কোন্ মাল সরবরাহ হয়েছে অর্ডারের বাহিরে—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সুধাংশুবাবু সব বুঝে নেন। মাঝখানে নবারুণের মুখ থেকে শুনে কাগজে লিখে নেন।

নবারুণ বলে: পেটি ক্যাশে রাখার জন্য আমি আলাদা হাজার খানেক টাকার চেক দিয়ে যাচ্ছি। আর যদি আমার ফিরতে দেরী হয়—তবে আপনি ব্যাঙ্ক থেকে এই চেকটি ভাঙ্গিয়ে নেবেন। নবারুণ পৃথক পৃথক কয়েকটি চেক দিয়ে দেয় সুধাংশু বাবুকে।

ক্রমে ক্রমে নবারুণ মোটামুটি সব কাজ বুঝিয়ে দেয় সুধাংশু বাবুকে। সুধাংশুবাবু কর্মঠ ব্যক্তি। তাঁর এ ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ করার মত ক্ষমতা আছে। ইতিপূর্বে নবারুণের অনুপস্থিতিতে তিনি কয়েকবার আফিসের কাজ চালিয়েছেন। কাজেই এবারে তাঁর কোনো অসুবিধাই হবে না। নবারুণ সুধাংশুবাবুর ওপর সব কাজের ভার দিয়ে সেদিনের মত অফিস বন্ধ করে দিয়ে চলে আসে।

॥ পাঁচ ॥

লনে একটি বেতের কেদারায় বসে অচিরা বিলিতী 'ফ্যাসানের' মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টে যাচ্ছে। অপরাহ্নেই শরীরটা তার এলিয়ে গেছে। সারাদিন সমাজ-সেবার কাজে সহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাতায়াত করে অচিরার মুখটা যেমন রোদে ঝল্‌সে গেছে, মনটাও তেমনি বিমর্ষ হ'য়ে উঠেছে। সবুজ মসৃণ ঘাস। প্রশস্ত লনের এক পাশে সে বসে আছে, আর তারই দু' তিন গজ দূরে ট্যাবি একটা বল নিয়ে খেলা করছে। অচিরা একবার শিষ দিলেই ট্যাবি এসে তার সামনের পা দুটো তুলে দেয় তার কোলে। আবার তার ধমক পেলেই চলে যায় ট্যাবি।

মাঝে মাঝে তন্ময় হ'য়ে অচিরা লক্ষ্য করে ট্যাবিকে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এই নিরীহ প্রাণীটির দিকে। গুজরাটি মেয়ের মত ঘুরিয়ে কাপড় পড়েছে অচিরা। গায়ে কাশ্মিরী বুটি-তোলা সূতীর ব্লাউজ। মাথায় জড়ান মোতিয়ারী বেলের গোড়ে। ভারী সুন্দর তাকে দেখাচ্ছে। মেয়েদের রূপ পোষাকী। অলঙ্কারের প্রচলন তো সেই জন্যই। শুধু রূপ থাকলে চলবে না। রূপের জৌলুষ বাড়ানোর জন্য চাই অলঙ্কার, পোষাক। যে সব মেয়ের একটু অন্তত চটক আছে, তারা রঙীন শাড়ী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়লে—ভালই মানায়। পুরুষদের স্বভাব মেয়েদের ভাল করে দেখা। কিন্তু যারা তা দেখে না—তারা পরমপুরুষ, মহাপুরুষ।

কী যেন ভেবে অচিরা ফ্যাসানের পত্রিকাটা তার পাশে বুজিয়ে রেখে দিল। হঠাৎ তার চোখ পড়ে গেটের দিকে।

নবারুণ ফিরছে অফিস থেকে। অচিরা তাকিয়ে থাকে গাড়ীর দিকে। গাড়ী এসে থামে গাড়ীবারান্দার নীচে। গাড়ীর দরজা বন্ধের আওয়াজ আসে অচিরার কানে। অচিরা এতটুকু চঞ্চল হয় না। সন্ধ্যার আকাশ দেখতে তার ভাল লাগে—তাই সে নিজের মনকে নবারুণের কাছ থেকে সরিয়ে এনে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। আকাশের বুকে এখুনি ফুটে উঠবে অসংখ্য তারা। কতকগুলির নাম তার জানা আছে, আবার কতকগুলি অনামিকা বলে মনে হয় অচিরার। তারার ভীড়ের মাঝখানে স্বাতি, পুষ্যা, ভরোনীদের যদিও বা খুঁজে পাওয়া যায়—অন্য-গুলিকে খুঁজে পাওয়ার জন্য এষ্ট্রনমি শাস্ত্রে বেশ দখল থাকার প্রয়োজন। নবারুণ গেটে ঢোকার সময়েই অচিরাকে দেখতে পেয়েছিল। তাই সোজা এসে দাঁড়ায় অচিরার সামনে।

অচিরা যেন খুব খুশী হ'য়েছে নবারুণকে দেখে, তাই বলে ওঠে: আজ এত শীগ্‌গির ফিরলে যে?

—কেন ফিরতে নেই বুঝি? ব'লে নবারুণ পাশের কেদারায় বসে পড়ে।

অচিরা ঠিক গুছিয়ে কথা বলতে পারেনি। হঠাৎ নবারুণকে সশরীরে উপস্থিত হতে দেখে এই কথা বলে ফেলেছে। একটু লজ্জিত হ'য়ে যায় অচিরা। বলে ওঠে সে: না—না, আমি তা বলছি না। আমি বলছি, আজ তোমার কাজ এত শীগ্‌গির শেষ হ'য়ে গেল।

নবারুণ কৌতুক করার জন্য বললে: তোমার কী ধারণা

কাজের নাম ক'রে—আমি দেরী ক'রে বাড়ী ফিরি। তা যদি তোমার ধারণা হয়—তবে তুমি ভুল করবে।

—আমি তো কিছুই বলিনি। তুমি নিজেই প্রশ্ন করছো, আর নিজেই আমার হ'য়ে তার উত্তর দিচ্ছ। কাজ তুমি করো সত্যি, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনকে প্রবঞ্চনা করে কাজ করো বলেই—তোমার মনে এত দ্বন্দ্ব। এ অবশ্য আমার কথা নয়। এ তোমার কথার খেই ধ'রে আমি তোমাকেই জবাব দিলুম।

এই কথা বলে অচিরা যেন বেশ একটু গম্ভীর হ'য়ে যায়। সে নবারুণকে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই তার মনে কোথায় যেন একটা ক্ষোভ আছে। সে কথা কোনোদিন অচিরা প্রকাশ করে না।

নবারুণকে সে নিজেই বেছে নিয়েছিল বিয়ে করার জন্য। অবনীবাবুকে দিয়ে নবারুণকে প্রস্তাব করার মূলেও ছিল অচিরা। কিন্তু আজ তার খুব পরিতাপ হয় সে জন্য। নিজের যা কিছু ছিল—সবই উজাড় করে সে দিয়েছে নবারুণকে। কিন্তু তার পরিবর্তে সে কি পেয়েছে? লোকে হয় তো ভুল বুঝে থাকে অচিরাকে। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি যে কর্তব্য আছে, তা যদি স্ত্রী পালন না করে—তবে লোকে নিশ্চয় সে স্ত্রীকে মন্দ বলবে। কিন্তু অচিরার দোষ কোথায়? সে তো সাধারণ অন্যান্য স্ত্রীর চেয়ে ঢের ঢের বেশী ভালবাসে তার স্বামীকে। কিন্তু স্বামী আসলে যদি তার স্ত্রীকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে, তবে সেই স্ত্রী যদি নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য সমাজ-সেবা, পার্টি, নাচ, গানের

মধ্যে সব সময় আটকে রাখতে চেষ্টা করে—তবে তার অপরাধ কোথায়? আকাশে মেঘ আছে—অথচ বৃষ্টি নেই। সূর্য আছে অথচ তেজ নেই! রূপ আছে অথচ ভাগ্য নেই। অচিরার অবস্থাটা ঠিক সেই রকম। অচিরা তার প্রয়োজন মত নবারুণকে পায় না বলেই—এই ক্ষোভ। একদিন কথার মাঝে নবারুণ অচিরাকে বলেছিল: তোমাকে আমি বিয়ে করেছি অর্থের জন্য। তোমাকে আমি বিয়ে করেছি একজনের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

আজ এই মুহূর্তে অচিরার মনে সেই কথাগুলো এসে ভীড় করে। অচিরাকে বিয়ে করার মূলে ছিল উদ্দেশ্য।

এতক্ষণ দু'জনের মধ্যে কোন কথা হয়নি। নবারুণ ট্যাবিকে নিয়ে খেলা করছিল আর অচিরা মন খারাপ করে বসেছিল।

ছকু এসে চা আর দু' প্লেট স্যাণ্ডউইচ্ রেখে যায়। আর তার সঙ্গে দিয়ে যায় নোন্‌তা বিস্কুটের একটি কৌটো।

অচিরা চায়ে দুধ মিশিয়ে চিনি দিয়ে নাড়তে নাড়তে পেয়ালটা এগিয়ে দেয় নবারুণের দিকে। নবারুণ হেসে তা গ্রহণ করে। বলে. ধন্যবাদ মেম সাহেব।

অচিরা নিজের জন্য কেট্‌লী থেকে একটু লিকার ঢেলে নেয় আর একটি পেয়ালায়। তারপর দুধ আর চিনি মিশিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে ওঠে: আচ্ছা—একটা সত্যি কথা বলবে?

—কি কথা? চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নবারুণ জিগেস করে।

—তুমি বিয়ে করেছিলে কেন ?

—যদি বলি তোমার বাবার অনুরোধ রাখার জন্য ?

—সত্যি কি তাই ?

—কেন, এ কথা কি তোমার মন মানতে চাইছে না ?

—না। অচিরার কণ্ঠস্বর ভারী শোনায়।

নবারুণ কী উত্তর দেবে তা ঠিক করতে পারে না। অকারণে অপ্রিয় সত্য কথা বললে অচিরা যে দুঃখ পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই কথার মোড় ঘোরাবার জন্য নবারুণ বললে : সত্যি কথা বললে তুমি তো কিছুতেই আমাকে বিশ্বাস করবে না। তবু বলছি শোন ; একটা ভবঘুরে যদি হঠাৎ সুযোগ পায় এক রাজকন্যাকে বিয়ে করতে, সে নিশ্চয় তখুনি রাজী হ'য়ে যাবে বিয়ে করতে। এর প্রথম কারণ, রাজকন্যার সঙ্গে সঙ্গে তারও আদর যত্ন হবে যথেষ্ট। সব চাইতে বড় কথা সম্পূর্ণ রাজত্বটা ভোগ করার সুযোগ। আমরা যতই না সমাজতন্ত্রবাদের যুগে এসে ঠেক্ খাই, তবু জানবে—আমাদের যড় রিপুর 'লোভটি বেশী করে আমাদের মগজে ঢুকে প'ড়ে তার কসরৎ দেখায় অচিরা হেসে ফেলে। হেঁয়ালির মধ্যে যতটুকু সার বস্তু, তা তার গোচরীভূত হ'য়েছে।

কিন্তু সব মেয়েরা না হোক, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েরা তার প্রিয়জনের কাছ থেকে একটু আদর, একটু যত্ন পেলে গলে যায়।

নবারুণ যখন অচিরার একটা হাত নিয়ে বললে : তোমার

আর আমার সেতুবন্ধ হ'চ্ছে এই দুটি হাতের মিলনে। হাতের মধ্যে পাওয়া যায় সাড়া। এই যে তুমি নির্ভয়ে তোমার হাতটি রেখেছ আমার হাতের ওপর—এইটেই জীবনের পরম সম্পদ—এইটেই জীবনের পরম আনন্দ। তুমি অনেক সময় আমাকে ভুল বুঝে রূঢ় ব্যবহার করে থাকো। আমি কিন্তু তাতে এতটুকু বিচলিত হইনা। যার দয়ায় আমি জীবিকা অর্জন করছি, যার সৌভাগ্যের একটি অংশ আমি জোর করে ভোগ করছি, তার যদি রাগের ঝুঁকি আমি সহ্য না করি—তবে সত্যিই খুব অন্যায় করা হবে। তুমি আমার ওপর রাগ করে অনেক সময় নিজের রুচি বিরোধী কাজ করে থাকো। তার জন্য তোমার ক্ষোভের আর শেষ থাকে না। আমি তোমার দুঃখ দেখলে—বেশী দুঃখ পাই। কিন্তু মজা কী জানো—তোমার অপরিণত মন কিছুতেই আমাকে বিশ্বাস করে না। এইখানেই তোমার মনের সঙ্গে আমার গরমিল।

নবারুণ এই কথা বলে চুপ করে যায়। কয়েকটুকরো বিস্কুট ছুঁড়ে দেয় ট্যাবির দিকে।

অচিরা নিরুত্তর। এর আর জবাব কি থাকতে পারে? ট্যাবি বিস্কুটের টুকরোগুলো ঘাসের মধ্য থেকে খুঁটে খুঁটে বার করে খেতে থাকে। অচিরা একমনে তাই শুধু লক্ষ্য করে।

নবারুণ বলে: মেয়েদের মনস্তত্ত্ব আমার জানা নেই। তা যদি জানো থাকতো, তা হ'লে দেখতে আমি তোমাকে সহজেই জয় করে ফেলেছি।

—জয় তুমি অনেকদিনই করেছ। নিজের অজ্ঞাতে জয় করেছ বলে—জয়ের গৌরব যে কী, তা তুমি আজও বুঝতে পারনি।

নবারুণ বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে থাকে অচিরার দিকে। তবু অচিরা বলে চলে: খুব কম পুরুষকে দেখেছি নীচের দিকে তাকিয়ে চলতে। তুমিও পায়ে চলার পথটাকে দেখে চলো না। তাই তো আমার পরাজয়ে আমি আনন্দ খুঁজে পাই না।

নবারুণ এবার উঠে দাঁড়ায়, তারপর বলে: চলো ভেতরে যাই।

—চলো। ব'লে অচিরাও উঠে পড়ে।

তারপর দু'জনে হাত ধরাধরি করে এসে ঢোকে তাদের বসার ঘরে।

মনের মতন করে সাজান এই বসার ঘরটি। অচিরা শিল্পের পূজারী। সারা ঘরটি সে নিজের মনের মতন করে সাজিয়েছে। টেবিলের উপর ফুলদানিতে রয়েছে ম্যাগনোলিয়া গ্ল্যাণ্ডিফ্লোরা। এটি অচিরার নিজের বাগানের ফুল। তাই সে নিমীলিত চোখে তাকিয়ে থাকে ফুলটির দিকে। নিখুঁতভাবে সাজান এই ঘরটি। সমসাময়িক বহু বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর চিত্র রয়েছে টাঙানো। জাফরানী রঙের পর্দা ঝুলছে দরজা, জানালায়।

মেঝের উপর পাতা রয়েছে পারস্যের কার্পেট। কাশ্মিরী জাফরী কাটা টেবিলকে ঘিরে রয়েছে বার্মা টিকের মেহগ্‌নী পালিশ করা কোচ সেট। মাঝে মাঝে টিপয় ছড়ানো রয়েছে।

দক্ষিণ দিকের দেয়াল ঘেঁষে বসান আলমারিটায় সেকালের আর একালের ইংরেজী, বাঙলা বই-এ ঠাসা। এ ছাড়া বই-এর সেলফে কেষ্টনগর ও আদি কলকাতার পটুয়াদের তৈরী নানান রঙের পুতুল সাজান রয়েছে।

নবারুণ ও অচিরা এসে পাশাপাশি বসে। এবার নবারুণ শুরু করে প্রথমে : মেম সাহেব, ছুটি দেবে ক' দিনের ?

অচিরা এইভাবে আলাপের জন্য প্রস্তুত ছিল না। মনে যেন তার কী রকম খট্‌কা লাগে। এ ভাবে তো নবারুণ কোনদিন যাবার অনুমতি চায়নি। আজ হঠাৎ একি হ'লো তার ?

অচিরার কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে নবারুণ বলে : মেমসাহেব, তোমার ছুটি না পেলে আমার যে যাওয়া হবে না।

অচিরা খুব গম্ভীর হ'য়ে বলে : না। ছুটি হবে না।

—ছুটি যে আমার চাই।

—কোথায় যাবে ?

—পুরীতে। খুব ছোট্ট করে উত্তর দেয় নবারুণ।

—হুঁ। কিন্তু, কেন যাবে আর কোথায় বা যাবে ?

—পুরী যাবো দিন কতকের জন্য ঘুরে আসতে। অমিয় লাহেড়ীর বাড়ীতে। তার কাছ থেকে অনুরোধপত্র এসেছে।

অচিরা বলে : বল না মনীষাদের বাড়ী যাবে। সরাসরি বলতে সংকোচ বোধ করছো কেন ?

নিমন্ত্রণ এসেছে অমিয়র কাছ থেকে। তাই তার নাম বললাম।

কিন্তু অস্বীকার কোরনা নবারুণ—যাবার তাগিদ শুধু মনীষার জন্য। ঐ তো তোমার প্রথম প্রেম। ও সহজে ভোলা যায় না।

হো···হো···করে হেসে ওঠে নবারুণ। বলে: প্রেম এখন বাষ্প হ'য়ে গেছে। অমিয় বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে যাবার জন্যে, তাই যাব বলে মনস্থ করেছি। আর তাছাড়া তুমি তো তোমার মাসীমার কাছে মুসৌরী যাবে বলছিলে। যাও না, ঘুরে এসো একটু। দেশ-বিদেশ না ঘুরলে শরীর ও মন কিছুই ভাল থাকে না।

অচিরা একটু মৃদু হাসে। তারপর বলে: দেশ-বিদেশ বেশী ঘুরলে আমার আবার বাতিক হ'য়ে যাবে বই লেখা। ঐ বই লেখার বাতিক বড় সংঘাতিক। শেষে দেখবে 'নবপঞ্চতন্ত্রম', 'আমীর উজীরের কাহিনী' নাম দিয়ে বই ছাপতে শুরু করেছি। বাঙলা দেশ বড়ো মজার দেশ। একজনকে পণ্ডিত বানিয়ে আর পাঁচজনে নাচতে শুরু করে দেয়।

নবারুণ বলে: পণ্ডিতকে পণ্ডিত বানায়। মুর্খকে পণ্ডিত বানানোর পরিণাম বড়ো সাংঘাতিক।

অচিরার যেন সহ্য হয় না। বলে: দেখো, আজো দেখবে রামছাগলের পিঠে বাঁদর চড়িয়ে কতলোকে চাল ও পয়সা রোজগার করছে। এসব হামেশা দেখবে কলকাতায়। বাঁদর দেখে যারা বাঁদরের মালিককে পয়সা দেয়—তারাও তো বাঁদর বলতে হবে।

নবারুণ হাসে। কোন জবাব দেয় না সে অচিরার এই কথায়। অচিরা আবার শুরু করে : আমি মুসৌরী যাবো না।

—কেন ? এই তো সে দিন তুমি বললে, নীলু মামীমার কাছে কদিন গিয়ে কাটিয়ে আসবে !

—দিন বলতে নিছক ক'দিনই হ'য়ে যায়। আর এক মাস পরেই তো ওরা নেমে আসবে।

—না—না। এখনো দু' মাস ওখানে থাকা যাবে। ওদের নেমে অসেতে এখন অন্তত দু' মাস সময় আছে।

—বেশ, আমি যাবো। কিন্তু আমি ওদের সঙ্গে নামবো। তার আগে যতই তুমি বল না কেন—আমি কিছুতেই ফিরব না কলকাতায়। এ দিকের কি ব্যবস্থা করেছ ?

—কোনদিকের ?

—অফিসের।

—অফিসের ব্যবস্থা আমি করেছি। তাছাড়া বেশী দূরতো নয় তার ক'রে দিলেই আমি চলে আসবো। তা ছাড়া—তুমিও চলো না কয়েকদিন পুরী থেকে ঘুরে আসবে ?—তুমি তো আমাকে মুসৌরী যেতে বলেছ। কৈ আগেতো এ কথা বলনি ? তুমি নিজেই যাবে বলে মনস্থ করেছ। এর মধ্যে আমাকে নিয়ে গেলে অসুবিধা হবে।

নবারুণ বলে : মনীষার বাড়ী তুমি কোনদিন যাবে না ব'লে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলে। তাই এবার ওখানে যাবার জন্য তোমায় অনুরোধ জানাতে সাহস হয়নি।

—আমি সঙ্গে গেলে তুমি যে খুশি হও না—তা আমি বুঝি। তা ছাড়া আমি গেলে তোমার অবসর নেওয়া মাটি হ'য়ে যাবে।

—অচিরা, এ তোমার কথা নয়। সত্যি কথা, আমি মনীষার জন্যই যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে খেলো করে যাওয়ার প্রবৃত্তি আমার কোনদিনই নেই।

নবারুণ আরো বলে: অচিরা তুমিই আমার অহংকার। আমার জীবনের অনেক অনুচ্ছেদই তোমার জানা নেই। তোমাকে নিয়েই আমার পরিচয়। নিজের বলতে তো কিছুতেই নেই। তোমার জন্যই আমার মান, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য। তাই আমি সব সময়ে সন্ত্রস্ত থাকি, ভয় হয়—পাছে তোমাকে আমি আমার অজ্ঞাতে কোথাও ছোট করে ফেলি।

অচিরা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে। মনের সঙ্গে সে লড়াই ক'রে আর এঁটে উঠছে না। সে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়।

বড় এলাচ খেতে ভাল লাগে অচিরার। রূপোর বই-ডিপে ভর্তি থাকে এলাচ। একটি এলাচের খোসা ছাড়িয়ে কয়েকটি দানা দেয় নবারুণের হাতে। বাকি কয়েকটি নিজের মুখে ফেলে চিবোতে থাকে। এটা অচিরার এক রকম নেশা। তারপর অচিরাই সুরু করে: আমি মুসৌরীই যাবো। আর তোমার সঙ্গে যেতে হ'লে আমি পুরী কেন যাবো? আমি যাবো ওয়ালটিয়ার, হোইটফিল্ড, ভাইজাগ, কলম্বো।

একটু বিদ্রূপ করে সে বলে: পুরীর সমুদ্র মনীষার। আমি উপসাগরে খুশি নই। আমি চাই সাগর। মনীষার থাক

বঙ্গোপসাগর, আর আমার প্রশান্ত মহাসাগর।

এতক্ষণ পরে অচিরার মুখ হাসিতে ভরে যায়। অচিরা বলে: তোমার ছুটি মঞ্জুর। কিন্তু একটা কথা, প্রশান্ত সাগর বা অতলান্তিক থাকতে যেন বে-অফ-বেঙ্গলে ডুব দিও না। তাতে তোমার মনের দীনতা প্রকাশ পাবে।

নবারুণ বলে: হ্যাঁ। কিন্তু সাঁতার আমার জানা আছে। ছেলেবেলায় ওয়েলেসলি ট্যাঙ্কে সাঁতার কেটেছি। দুবার যাতায়াত করলেও হাঁপিয়ে উঠতুম না। এখন বয়স হ'য়েছে, সাঁতরাতে গেলে কাহিল হ'য়ে পড়বো।

অচিরা বলে: সাঁতার কাটতে জানা থাকলে জানবে, তুমি কখনই তা ভুলবে না। অভ্যাস না থাকলেও জানবে—জলে নামলে আপনিই সাঁতরাতে পারবে।

—তোমার ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট অচিরা।

অচিরা হাসে। প্রাণ খুলে সে হাসে। এমন হাসি সে অনেকদিন হাসেনি। নদীতে জোয়ার এলে যেমন জলের উচ্ছলতা বাড়ে, আজ তেমনি অচিরার মধ্যে জোয়ার এসেছে। অচিরা খুশিতে যেন টইটম্বুর। কেন এত খুশি, কী কারণে খুশি তা নবারুণ বোঝে না।

নবারুণ অচিরার এই রকম হাসি দেখে কৌতুক অনুভব করে। মন উজাড় করে অচিরা হাসছে।

হাসির বেগ একটু থামতে অচিরা বললে: তুমি যদি পুরী যাও—আমি যাবো মুসৌরী। এ কদিন এ বাড়ীটা খাঁ খাঁ করবে।

বেচারী ট্যাবি সারাদিন ধরে ছকুর পিছু পিছু শুধু ঘুরবে। ছকু যদি খেতে দেয় খাবে। না দিলে সারা বাড়ী শুধু শুঁকে বেড়াবে। তুমি কতটুকুই বা এ বাড়ীতে থাকো। তবু তুমি চলে গেলে এ বাড়ীর শ্রী যেন চলে যায়। আমারও তাতে বেশ কষ্ট হয়।

নবারুণ একমনে শুনছিল অচিরার কথাগুলো। এবার কিন্তু সে উত্তর দিলেঃ আমি আর কখন তোমাকে ছাড়া কোথাও যাব না অচিরা। শুধু এই বারটার জন্য আমাকে ক্ষমা করো। তুমি যদি জিদ্ ধরো তো আমি যাবো না। শুধু এই বারটি আমি যাবো। অমিয় মনীষার তাগিদেই চিঠি লিখেছে। হয়তো ওদের কোনো বিপদ। তুমি থাকলে ওরা হয়তো তা প্রকাশ করবে না। মনীষা আমাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করুক এটা আমি চাই। আর এরই জন্য আমি শুধু অপেক্ষা করছিলাম। তুমি জান না অচিরা—মনীষা যদি আমার সাহায্য গ্রহণ করে, তবে জানবে আমি সত্যি খুব শান্তি পাবো।

অচিরা, টেবিলের ওপরের এ্যাশ্‌ট্রেতে আধপোড়া সিগারেটটা নিয়ে নিজের মনে ঘষতে ঘষতে বললেঃ এটা তোমার মনের দৈন্য। একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, যতদিন তোমার মনে প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে থাকবে ততদিন তুমি তোমার সকল সত্তাকে অস্বীকার করছো বলে জানবে। মেয়েরা সাধারণতঃ অতীতকে আঁকড়ে থাকে না। বর্তমানকে নিয়েই তারা সুখী হ'তে চায়। মনীষাকে তোমার মত না চিনলেও, আমার মন দিয়ে তাকে চিনি।

ব্যক্তিগতভাবেও তাকে চেনার সুযোগ আমার হ'য়েছে। অবশ্য তা তোমারই জন্য। অকারণে তার বিষয় যদি বেশী চিন্তা করো —তাতে তুমিই বেশী দুঃখ পাবে। তার মনে কিন্তু এর এতটুকু আঁচড় আর নেই। আমার অনুরোধ, তুমি নিজেকে আর ছোট ক'রো না তার কাছে। নিজেকে ছোট করে ফেললে—খুব দুঃখ পাবে। তার আঘাত সহ্য করার মত তোমার কোনো শক্তিই নেই।

এই কথা বলতে বলতে অচিরার চোখ জলে ভরে যায়। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না।

নবারুণ অচিরাকে যা গোপন করতে চেয়েছিল—তা তার নিজেরই অজ্ঞাতে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। নিজেকে সংযত করে নিতে সে চেষ্টা করে।

নবারুণ বলে ঃ শুধু বেড়ানর জন্যই আমি পুরী যাচ্ছি। তুমি কিন্তু সবটাই আমাকে ভুল বুঝেছ। মনীষার কথা তুলে দেখলুম —তুমি কী বলো। তোমাকে পেয়ে—আমার আর কোনো ক্ষোভ নেই অচিরা। ঈর্ষা হ'চ্ছে ভালবাসার কষ্টিপাথর। তোমাকে যাচাই করার আজ খুব সুযোগ পেয়েছি। তাই লোভ সামলাতে পারলাম না।

অচিরা নবারুণের অলক্ষ্যে তার চোখ মুছে ফেলেছে। একটু মৃদু হেসে বলে ঃ যাচাই করে দেখলে কি ?

—তোমার ভালবাসায় খাদ নেই।

অচিরা এর কোন উত্তরই দেয় না। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ

থাকে। শেষে অচিরা বলল : আমি মুসৌরী যাব না।

—কেন ?

—ইচ্ছে হ'চ্ছে না। তবে হ্যাঁ—পুরীতে কিন্তু তোমার বেশী দিন থাকা হবে না। আর একটি সর্ত, দু'দিন অন্তর চিঠি দেবে। আমার চিঠি না পেলেও তুমি নিয়মিত চিঠি দিয়ে যাবে।

নবারুণ অচিরার সকল সর্ত পালন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

॥ ছয় ॥

কলম্বাস যে দিন তাঁর প্রথম যাত্রা সুরু করেছিলেন সে দিন তাঁর মনে কী হ'য়েছিল—তা আমার জানা নেই, তবে নবারুণের মনে আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। সে যে কী উদ্দীপনা—তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবী। খুব সাধারণ পোষাকে সে রওনা হ'চ্ছে পুরী। আজ প্রায় পাঁচ বছর পরে তার সঙ্গে মনীষার দেখা হবে। সঙ্গে আছে মাঝারি ধরনের একটি সুটকেশ। তার মধ্যে বোঝাই করে নিয়েছে তার প্রয়োজনীয় যত জিনিসপত্তর। হাতে আছে এক কৌট সিগারেট। কোলকাতা থেকে পুরী যেতে এক কৌট সিগারেটই যথেষ্ট। তার বেশী প্রয়োজন হ'লে যে কোনো ষ্টেশন

থেকে কিনে নেওয়া যাবে।

আসার সময় অচিরা বার বার করে বলে দিয়েছে নবারুণকে চিঠি দিতে। নবারুণও সত্যি পৌঁছে চিঠি দেবে বলে কথা দিয়েছে। কিন্তু অচিরা স্টেশন পর্যন্ত আসেনি। এটা যেন খুব খারাপ লাগে নবারুণের। মেয়েদের মন বোঝা ভয়ানক কঠিন। নদীর মত কখনো জোয়ার, আবার কখনো ভাঁটা। নবারুণ আজ পর্যন্ত একলা যেখানেই গেছে—অচিরা এসেছে তাকে ট্রেনে তুলে দিতে। কিন্তু এবারে অচিরা আসেনি। শুধু এই কথাটা ভেবে নবারুণের মনটা যেন একটু খারাপ হ'য়ে ওঠে। ট্রেন চলতে সুরু করলে—নবারুণ আর সে কথা ভাবে না। ট্রেনের কামরায় একটি ভদ্রলোক ও একটি মহিলা ছাড়া আর কোন যাত্রী নেই। এঁরা দুজনেই একই পরিবারভুক্ত ব'লে মনে হয়। কিন্তু পরস্পরে বাক্যালাপ নেই, দেখে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। নবারুণ এঁদের কী সম্পর্ক বা সম্পর্ক আদৌ আছে কী না—তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না। জানলার ধারটিতে বসে সিগারেট ধরায় নবারুণ। এখন শুধু তার চিন্তা কতক্ষণে পুরী পৌঁছনো যায়। বাঙলার সীমান্ত পার হবার আগে থেকেই পুরী পৌঁছনোর জন্য নবারুণের মন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

হঠাৎ ভদ্রলোকটি মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বলেন: আমার জামা কাপড় বার করে দাও। ভদ্রমহিলাটি সীটের নীচে থেকে একটি ফাইবারের সুটকেশ টেনে বার করেন। তা থেকে একটি

স্লিপিং সুট বার করে ভদ্রলোকটির দিকে এগিয়ে দিলেন। ট্রেন চলেছে। বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবার জন্য। বাঙলার সবুজ বিস্তীর্ণ মাঠ অতিক্রম করে ট্রেন চলেছে। যাত্রীদের মধ্যে আশা, হতাশা, উদ্দীপনা সবই আছে। যারা শিশু তাদের মনে আছে এক কৌতূহল।

নবারুণ সিগারেটের শেষ অংশটুকু বাইরে ফেলে দিয়ে ওপরের বার্থে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ট্রেনে পড়ার জন্য কয়েকটি দেশী-বিদেশী পত্রিকা নিয়েছে সঙ্গে, কিন্তু পড়তে নবারুণের মন বসে না। মনের কোন স্থিরতা নেই। ট্রেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মনটা চঞ্চল হ'য়ে আছে। কিছুক্ষণ ট্রেন চলার পর নবারুণ সহযাত্রীটির নাম জানতে পারে। তাদের আলাপ ও আলোচনা থেকে সে যা সংগ্রহ করতে পেরেছে—তা হ'চ্ছে এই ঃ

ভদ্রলোকটির নাম প্রশান্ত ও মহিলাটির নাম কনকলতা। এঁদের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রী নয়, এঁরা মা ও ছেলে। প্রশান্তর বাবা হ'চ্ছেন ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তি। প্রশান্ত ও তার তিন ভাই বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তার বাবা কনকলতাকে বিয়ে করেন। কনকলতা কিন্তু এ বিয়েতে খুশি হয়নি। তবু হিন্দুর ঘরের মেয়ে, বাবা-মার নির্দেশ মত স্বামীগৃহে কয়েক বছর অন্তত থাকার পর যখন অসহ্য মনে হ'য়েছে—তখনই সে গৃহ ত্যাগ করে চলে আসে পথে। বাবার কাছে কনকলতা অভিমান করেই যায়নি। কনকলতা যেন তাদের গলগ্রহ ছিল। তা না হ'লে সাত তাড়াতাড়ি বয়স্থ, দ্বিতীয়-পক্ষ স্বামীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার আর কী কারণ

থাকতে পারে! প্রশান্তর বাবার নির্যাতন সহ্য করার মত কোন শক্তি ছিল না কনকলতার। তাই প্রশান্তর হাত ধরে সে বেরিয়ে আসে পথে।

অনুমান, প্রায় সাত মাস আগে এরা ঘর ছেড়ে নেমে এসেছে পথে। সামাজিক বন্ধন, জীবনের শৃঙ্খলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে নিশ্চয় ইচ্ছে করে কনকের। তাই কোন বন্ধনই আজ তাদের এই যাত্রাপথকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। দু'জনে মিলে চলেছে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। গ্রামের লোকেরা প্রশান্ত ও কনকের নামে নিন্দা রটিয়ে যাচ্ছে। প্রশান্তর বাবা স্বয়ং স্বীকার করে থাকেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে যে, তাঁর পুত্রের সঙ্গে কনকের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কনক চরিত্রহীনা, সমাজ-জীবনের দুষ্ট ব্যাধিস্বরূপ। এই ব্যাধির বীজাণু যদি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা না যায়—তবে একদিন এই ব্যাধি বিপর্যস্ত করে দেবে আমাদের সমাজ-জীবনকে। এ আশঙ্কাও করে থাকেন প্রশান্তর বাবা। কিন্তু নবারুণ লক্ষ্য করেছে—এদের মধ্যে রয়েছে শুচিতা। কী পবিত্র মন নিয়ে এরা কথা বলে থাকে! এদের দুজনের মধ্যে কী নিগূঢ় সম্পর্কই না গড়ে উঠেছে! নিজের চক্ষে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।

এদের দু'জনের বয়স প্রায় একই হবে। জোর, প্রশান্ত বয়সে দু' এক বছরের বড় হবে কনকের চেয়ে। তবু নবারুণের যেন গভীর শ্রদ্ধা হয় প্রশান্তর ওপর। কী মধুর সম্পর্ক এদের।

কনক ও প্রশান্ত সমবয়সী হ'লেও—মা ও ছেলে। যারা নিন্দুক, তারা তাদের অভ্যাসমত নিন্দা রটিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও যে রটাবে—তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে! নবারুণের খুব ভাল লাগে এদের। কী সৌম্য, শান্ত, মাতৃমূর্তি কনকের। সাধারণত এই বয়সে এ মূর্তি দেখা যায় না। নবারুণ কীসের ভাবে যেন অভিভূত হ'য়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে কনকের দিকে। নবারুণের চোখে ভাসে: মাতৃত্বের জ্বলন্ত ছবি। ম্যাডোনার সেই দীপ্ত হাসি যেন কনকের ঠোঁটে লেগে রয়েছে।

নীরবে নবারুণ লক্ষ্য করে এদের।

মাঝে মাঝে ট্রেন এসে থেমে পড়ে এক একটি স্টেশনে। যাত্রীদের ওঠা নামার কোলাহল। স্টেশনে ফেরিওয়ালাদের চীৎকার। সব মিলে সে এক বিচিত্র পরিবেশ। আবার সুরু হয় যাত্রা। কত নদ নদী, কত ক্ষেত ক্ষামার, পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে ট্রেন। গাড়ীর দোলায় অদ্ভুত রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে নবারুণের মন। নিশুতি রাতের ঘন অন্ধকারকে চিরে ছুটে চলেছে তার ট্রেন। শুধু কয়েকটি ঘণ্টা মাত্র। তারপর নবারুণ পৌঁছবে মনীষার কাছে।

একটি রাত্রির কথা বিশেষ করে মনে পড়ে নবারুণের। সে বার নবারুণ সিনিয়র কেম্‌ব্রীজ পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার ফল তখনো জানা যায়নি। ফাদার সিমন্স-এর সঙ্গে সে গিয়েছিল বেড়াতে আসানসোলে। ফেরবার সময় গাড়ীতে দেখা হ'য়ে গেল

—শশাঙ্ক, মনীষা ও তার বাবা জীবানন্দবাবুর
অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের জন্য মনীষা ও নবারুণ খুব ?
মনীষা চীৎকার করে নবারুণের নাম ধরে ডেকে উঠে।–

সিমন্স-এর সঙ্গে আলাপে জীবানন্দবাবু অত্যন্ত আনন্দিত হন। সে কারণে তিনি মনীষার জন্মদিনে নবারুণ ও ফাদার সিমন্সকে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাড়ীতে আসার জন্য। মনীষা যেন হাতে স্বর্গের চাঁদ পেয়ে গেল। তার পরের দিনই মনীষার জন্মদিন। তাই সেদিন কোলকাতায় পোঁছে জীবানন্দবাবু, শশাঙ্ক ও মনীষা বার বার করে ফাদার সিমন্স ও নবারুণকে মনীষার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে গেলেন।

পরের দিন নবারুণ ও ফাদার সিমন্স যথাসময়ে মনীষার বাড়ী উপস্থিত হ'লেন। মনীষা তো ক্ষণ গুনছিল এদের আসার জন্য। নবারুণ মনীষার জন্য নিয়ে গিয়েছিল রজনীগন্ধার একটি স্তবক ও রবি ঠাকুরের শোভন সংস্করণের 'শেষের কবিতা'। ফাদার সিমন্স নিয়ে গেছলেন একটি দামী মিলের শাড়ী। নবারুণ অবশ্য শাড়ী দেওয়াটা মোটেই অনুমোদন করেনি, কিন্তু ফাদার সিমন্স নবারুণকে বলেছিলেন: মেয়েরা নতুন পোষাক, পরিচ্ছদ আর গহনা পেলেই সব চেয়ে বেশী খুশি হয়। তিনি হেসে আরো বলেছিলেন: আমি তো সংসার কী—তা জানলুম না। তবু তোমরা আমার ছেলে মেয়ের মত। তোমাদের মন দিয়ে আমি সংসারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি। মনীষার বাবা ফাদার সিমন্স-এর জন্য বিশেষ আয়োজন করেছিলেন। অবশ্য শুধু ফাদার সিমন্স

ক বলে নয়—যে কোনো বিদেশীকে আপ্যায়ন করতে পারলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। খাবার টেবিলে বসে ইংরাজীতে আলাপ করতে ভারী পছন্দ করতেন জীবানন্দ বাবু। তাই সেদিন সে সুযোগ থেকে তিনি আর বঞ্চিত হন কেন? ফাদার সিমন্সকে নিয়ে সুরু করেছিলেন গল্প। ধর্মতত্ত্ব থেকে সাহিত্য পর্যন্ত। রাজনীতির আলোচনা দুজনেই এড়িয়ে গেছলেন বিশেষ কারণে। এদিকে নবারুণকে খুব নিকটে পেয়েই মনীষা তাকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করলো। মনীষা তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল লতিকা, ইরা, প্রতিমা, অনীতা, মলয়ার সঙ্গে। নবারুণকে থেকে যাওয়ার জন্যও মনীষা অনুরোধ করেছিল। কিন্তু রাত্রে হোষ্টেলের বাইরে থাকা কোনমতেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া, ফাদার সিমন্সও কিছুতেই রাজী হবেন না,—বলে দিয়েছিল নবারুণ।

মনীষা সে দিন সব সাদা পরেছিল। সাদা পোষাকে কী সুন্দর না তাকে দেখায়। সাদা জর্জেটের ব্লাউজ ও শাড়ী। গলায় ছিল মুক্তোর হার, কানে মুক্তোর টাব্। আর খোঁপায় জড়ানো ছিল জুঁই ফুলের গোড়ে মালা। মনীষা জুঁই ফুল বেশী পছন্দ করে।

নবারুণের চোখে সেদিন সবকিছু স্বপ্নের মত মনে হ'য়েছিল। বাড়ীর লোকেরা যখন অতিথি ও নিমন্ত্রিতদের নিয়ে খুব ব্যস্ত,তখন মনীষা নবারুণকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তার তিনতলার ঘরে।

সেই রাত্রে—মনীষা নবারুণের দু'টি হাত ধরে বলেছিল: কৈ আমাকে কিছু দিলে না?

নবারুণ প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেনি। পরে বলেছিল: তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই, মনীষা। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ থাকে। তারপর—মনীষা নবারুণকে একটু বসতে ব'লে নীচে চলে যায়। যাবার সময় ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সে বলেছিল: কিছু ভয় পেয়ো না। আমি এখুনি আসছি। নবারুণ এ সব কিছুই বুঝতে পারে না। ক্রমেই সে বিস্মিত হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে অজ্ঞাত বিপদের কথা ভেবে শিউরে ওঠে নবারুণ। বিপদে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন পথই থাকবে না। সেই সঙ্গে সুনামও ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা যথেষ্ট। কিছুক্ষণ পরে মনীষা এসে ঘরে ঢোকে। নবারুণ মনীষাকে দেখে বলেছিল: আলোটা জ্বালো। তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছি না।

চুপ—! অন্ধকারে মনীষার কণ্ঠে একটি অস্ফুট শব্দ শোনা যায়।

নবারুণ আর কোন কথাই সেদিন বলেনি। মনীষা এই প্রথম নবারুণকে সম্পূর্ণভাবে নিজের কাছে পেয়েছিল। সকলের অলক্ষিতে—রাত্রিকে সাক্ষী করে মনীষা নবারুণের ঠোঁটে এঁকে দিয়েছিল—তার প্রথম প্রেমের স্বাক্ষর। সেই মুহূর্তে নবারুণ তার সারা দেহে অনুভব করেছিল এক অভূতপূর্ব শিহরণ।

নবারুণের বুকে নিজের কান দিয়ে মনীষা বলেছিল: কৈ? কোথায় তোমার স্পন্দন নবারুণ?

নবারুণ নির্বাক। সেই মুহূর্তের জন্য যেন নবারুণের কণ্ঠরোধ হ'য়ে গিয়েছিল। একান্ত গোপনে পেয়ে মনীষা নবারুণের দেহের

সঙ্গে নিজের দেহকে যেন মিলিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। মনে ছিল তার অনন্ত ক্ষুধা। মনে ছিল তার দুর্নিবার প্রেম। জন্ম-দিনের উৎসব মুখরিত রাত্রির ছবি স্পষ্ট হয়ে আজ মনে পড়ে নবারুণের। মনীষার স্পর্শ, মনীষার কথা, মনীষার উন্মাদনা—নবারুণের মনে এনে দিয়েছিল এক নতুন জীবনের আস্বাদ। নিজের কান দিয়ে অনুভব করেছিল, মনীষার বুকের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বেদনার কাতরানি। তার স্পর্শে ছিল শিহরণ, চুম্বনে ছিল গভীর প্রেমের আস্বাদ। তার ঘনিষ্ঠতায় ছিল নারীত্বের অভি-ব্যক্তি। মনীষার উপস্থিতি নবারুণের মনে এনে দিয়েছিল জীবনের ঘ্রাণ। সেই মুহূর্তে, মনীষা সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছিল নবারুণের কাছে। বলেছিল ঃ নবারুণ, আমি তোমার। সম্পূর্ণ-ভাবে আমাকে গ্রহণ করো। আমি চাই—তোমার বন্ধনে নিষ্পেষিত হ'তে। এতদিন ধরে আমি শুধু তোমারই কামনা করে এসেছি। তোমার নিষ্পেষণে আমার মৃত্যু হোক। এই আমার মনের একমাত্র বাসনা।

কিন্তু, সেদিন নবারুণ মনীষার কাছ থেকে যা পেয়েছিল—তার চেয়ে সে বেশী কিছুই আশা করেনি। সেদিন, কোনো আদিম স্পৃহা সেই মুহূর্তটিকে কলুষিত করেনি বলেই—আজও নবারুণ মনীষার কথা ভেবে নিজেরই অজ্ঞাতে শিহরণ অনুভব করে থাকে।

জীবন জল-তরঙ্গে যে অনুরাগ—বুদ্বুদের মত একদিন দৃশ্য হয়েছিল, কালের আবর্তে তা ম্লান হয়ে গেল। শুধু বেঁচে রইল

সেই রাত্রের স্মৃতি।

নবারুণের আজও মনে হয়—মেয়েদের আদর করার পদ্ধতিটি ভারী সুন্দর। পুরুষের প্রতি লোলুপতার চরম বিকাশ হয়—তাদের হৃদয় নিষ্পেষণে। মনীষা তারপরে কত দিনই না আদর করেছে নবারুণকে, মনীষাকে কত ভাবেই না পেয়েছে নবারুণ। কিন্তু, জন্মতিথির রাত্রির যে উন্মাদনা, যে অনুভূতি সে পেয়েছিল, তা আর কোনদিনই ফিরে আসেনি তার জীবনে। সেই রাত্রি—তাদের জীবনের অসম্পূর্ণ রাত্রি। তবু কেন জানি না, নবারুণ উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে গিয়েছিল—আর একটি এমনি রাত্রির জন্য। সেদিন মনীষা ও নবারুণ, বিদায় চুম্বনের পর—দু'জনে নেমে এসেছিল দু'টি ভিন্ন সিঁড়ি দিয়ে।

তারপর নীচে এসে বিজলী আলোয় কেউই কারুর চোখের দিকে তাকাতে পারেনি। কোথায় যেন লজ্জা, কোথায় যেন তাদের গোপন প্রেমের অনুচ্চারিত ধ্বনি এসে অবসন্ন করে দিয়েছিল তাদের সেই সব উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে। মধ্যাহ্নে—প্রখর রৌদ্রতপ্ত মাটিতে এক পশলা বৃষ্টি এসে যেমন উত্তাপ হ্রাস করে দেয়, তপ্ততায় আসে শীতলতা। তেমনি এক শীতলতা দেখা গিয়েছিল নবারুণ ও মনীষার মধ্যে। কিন্তু অনুভূতির পরমায়ু অনেক। অনুভূতির বিনাশ নেই। স্পর্শে সজীব হ'য়ে ওঠে মন। সেই অনুভূতির আস্বাদ চেয়ে অনেক মন বিকল হ'য়ে গেছে। মন-বিকলনের এই তো প্রধান কারণ।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে নবারুণ। এতক্ষণ অতীতের

স্মৃতিপটে যে ছবির প্রদর্শন হচ্ছিল, তাতেই বিমোহিত হ'য়ে নবারুণ বর্তমানের কথা সম্পূর্ণই ভুলে গিয়েছিল।

স্টেশনে ফেরিওলাদের চীৎকারে সম্বিৎ ফিরে পায় নবারুণ। কনক ও প্রশান্ত গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। প্ল্যাট-ফর্মের অফিসের দেওয়ালে সাইন বোর্ড ঝুলছে 'পুরী'। নবারুণ ট্রেনের কামরা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে দূরে প্ল্যাটফর্মের শেষে কংক্রীটে জমানো স্তম্ভে বড়ো বড়ো করে লেখা রয়েছে 'পুরী'। সুটকেশ হাতে করে নেমে পড়ে নবারুণ। এ যে পুরী তাতে আর তার সন্দেহ নেই। পাণ্ডাদের সঙ্গে হোটেল ব্যবসায়ীরা যাত্রীদের নিয়ে টানাটানি করছে। একদিকে স্বর্গলাভ, অপর-দিকে স্বাচ্ছন্দ্য। নবারুণ তার সুটকেশটা হাতে করে প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। তারপর একটু ভীড় কমলে নেমে আসে পথে। সূর্যের তেজ তখন বেড়ে গেছে। একটি ঘরোয়া ট্যাক্সি করে সে রওনা হয়—মনীষার বাড়ীর দিকে।

॥ সাত ॥

সাধারণ একটি শাড়ী পরে মনীষা বসে আছে বাহিরের বারন্দায়। তার বারান্দায় বসে শুধু সমুদ্রের ঢেউ-এর কল্লোল শোনা যায় না—দেখা যায়। দু'পাশে ঝাউ গাছের সারি। মেঘের সঙ্গে এক মনে হয় সমুদ্র। বেতের চেয়ার, টেবিল। টেবিলে অসংখ্য

দেশী বিদেশী জার্নাল। কতকগুলো বাসি চিঠিও জড়ো হ'য়ে রয়েছে। একমনে বসে মনীষা একটা বাঙলা দৈনিক খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছে। দূর থেকে তার মুখ দেখা যায় না। খবরের কাগজের পাতায় মুখ তার ঢাকা পড়ে গেছে। সামনে একটু জমি। টবে করে সাজানো রয়েছে পাতাবাহার গাছ আর পুরোনো বেল, জুঁই ও অকালের বাহারি গোলাপ গাছ। বাড়ীতে ঢোকার মুখে একটা বড়ো ঝাঁঝরি কাটা লোহার গেট। ভেতর থেকে তাও বন্ধ রয়েছে। গেটের ধারে প্রকাণ্ড একটি জামরুল গাছ। ডালের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে দোলনার দড়ি। একটি ছোট ছেলে আর একটি তার চেয়েও ছোট মেয়েকে দোলনায় চড়িয়ে দোল দিচ্ছে সীতা। দোলনায় দুলতে ছোট ছেলেমেয়েরা খুব বেশী পছন্দ করে, তাই এদের মধ্যে বেশ একটা স্ফূর্তির ভাব দেখা যায়।

মনীষার মত সীতারও এ বাড়ীতে সব কিছুর উপর অধিকার আছে। তবে মনীষার মত তার অত প্রতিপত্তি নেই। সময়ে সময়ে মনীষার অনুমোদন না পেলে সীতা কোনো কাজ করে না। এটা অবশ্য অমিয়র এক রকম হুকুম। মনীষাকে বিয়ে করার ঠিক তিন বছর পরে অমিয় সীতাকে বিয়ে করে। সীতা বাঙালী, কিন্তু জন্মাবধি উড়িষ্যায় আছে। সীতার বাবা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী। জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি উড়িষ্যায় কাটিয়েছিলেন ব'লে, বাকি জীবনটা কটকে কাটানোর অভিপ্রায়ে এখানে ঘর বাড়ী করে থেকে গিয়েছিলেন। এক সময় সীতা

ছিল অমিয়র চিত্র-শিল্পের সঙ্গিনী। পথে, ঘাটে, ঘরে যেখানেই অমিয় ছবি আঁকতে বসেছে—পাশে থেকেছে সীতা। সীতা যেন অমিয়র প্রেরণা। মনীষা হ'চ্ছে তার পাটরাণী। বিয়ের পর মনীষা যখন সীতাকে দেখলো—অমিয়র সঙ্গে, তখন সে কিছুই বলেনি। ষ্টুডিওতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমিয় সীতার ছবি এঁকেছে। গল্প করতে করতে ইজেলে রঙ শুকিয়ে গেছে—তবু মনীষা একটি দিনের জন্য কোনো কথা বলেনি। অথচ অমিয় মনীষাকে নিয়ে একান্তভাবে কাটিয়েছে চাঁদের আলোয়—নির্জনে এই সমুদ্রতীরে। মনীষার যা প্রাপ্য, তা সে পেয়েছে অমিয়র কাছে। তাই সীতাকে বিয়ে করতেও মনীষা অমিয়কে কিছুই বলেনি। শুধু নিজের মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, ভগবান, আমাকে শক্তি দাও। আমার এই অভিশপ্ত জীবনকে বইবার জন্য শক্তি দাও। জীবনে যদি সুখ, শান্তি, না পাই—তবে দুঃখ ও অশান্তি দিওনা ভগবান। আমি কিছুই চাই না—শুধু সহ্য করার মত ধৈর্য দাও।

মনীষার মনের এই গোপন কথা অমিয় কোনদিন জানেনি বা জানতেও চায়নি। শুধু সীতাকে যে দিন সে প্রথম বিয়ে করে নিয়ে এলো এ বাড়ীতে, সে দিন মনীষাকে ডেকে বলেছিল ঃ তুমি দুঃখ করো না মনীষা। সীতাকে আমি ভালবেসেছি। তাকে বিয়ে না করলে মনে আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। তোমাকেও আমি ভালবাসি। তাই তোমারই পাশে এনে দিলুম সীতাকে। তোমরা দুজনে যদি আমাকে অকৃপণ হয়ে ভালবাস—তবে সার্থক হবে

আমার শিল্প সাধনা। সার্থক হবে শিল্প সৃষ্টি। মনীষা তার কোনো জবাব দেয়নি সেদিন। শুধু তার চোখের কোলে কয়েকবিন্দু জল টল টল করেছিল। এর পর বহুদিন কেটে গেছে। মনীষা অমিয়কে কোন দিন কোনো বিষয়ে অনুযোগ করেনি। অথচ সীতা, মনীষা ও অমিয়কে সমানভাবে ভালবাসে। মনীষার অসুবিধাগুলো সে বেশী বোঝে। মুখে সীতা কিছুই বলে না—কাজ ও ব্যবহার দিয়ে সে প্রমাণ করেছে মনীষাকে সে আন্তরিক ভালবাসে। মনীষা আঘাত পেলে সীতার দুঃখ হয়।

সাধারণত মনীষা ও সীতার যা সম্পর্ক—তাতে মিলের চেয়ে গরমিলই বেশী দেখা যায়। রাত্রিদিন কলহ, ঈর্ষাই প্রবলভাবে দেখা যায়। কিন্তু মনীষা ও সীতাকে যে না দেখেছে—সে কিছুতে বিশ্বাসই করবে না যে ওদের পরস্পরের সম্পর্ক কত মধুর।

মাঝে মাঝে মনীষা অবশ্য একথা ভেবেছে যে অমিয় সীতাকে বিয়ে করেই ভাল করেছে। অমিয় যা চায়—মনীষার কাছ থেকে সে তা পায় না। জীবনে যদি পরম আনন্দ না পাওয়া গেল—তবে তো সে জীবন ব্যর্থ। মনীষা তার নিজের অক্ষমতার কথাই বেশী করে চিন্তা করে এসেছে। সে যদি অমিয়কে সুখী করতে পারতো—তবে অমিয় কিছুতেই সীতাকে বিয়ে করতে পারতে না। সীতা নিশ্চয়ই অমিয়কে সুখী করতে পেরেছে। তা না হ'লে মনীষা থাকা সত্ত্বেও সে সীতাকে কি করে বিয়ে করে? মনীষার শিক্ষা আছে। জীবন সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা আছে, তাই অমিয়র এইকাজের জন্য সে কোনো অনুযোগই করে না।

তবু এ কথা স্বীকার করেতেই হবে—মনীষা অমিয়র স্ত্রী। নারীসুলভ মনোবৃত্তি তার মধ্যে আছে। তাই সীতাকে দেখে প্রথম প্রথম মনীষা শুধু ভগবানকে ডেকেছে। বলেছে: ভগবান, আমাকে শুধু সহ্য করবার শক্তি দাও।

অমিয় কিন্তু মনীষার সঙ্গে বিয়ে হবার সময় যেমন ব্যবহার করতো, আজও ঠিক তেমনি ব্যবহার করে যায়। সকলের অলক্ষ্যে পেলে নতুন বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী যেমন চঞ্চলতা প্রকাশ করে থাকে, অমিয় আজও তেমনিভাবে তার মনের কথা জানিয়ে থাকে মনীষাকে। কিন্তু মনীষা আবার এতটা পছন্দও করে না। মাঝে মাঝে তার মনে হয়—এ সবই কৃত্রিম। ভালবাসার মধ্যে সততা নেই। প্রথম প্রথম মনীষা সীতাকে এড়িয়েই চলতো। খাবার টেবিলে না বসলে খারাপ দেখায় বলেই মনীষা সীতার সঙ্গে বসতো খেতে। কিন্তু যতটা এড়িয়ে চলা যায়, মনীষা ঠিক ততটাই এড়িয়ে চলতো সীতাকে। কিন্তু সীতার ছেলে হওয়ার পর মনীষার মনের সে ভাবটা কেটে যায়। মনীষার আর অসহ্য লাগে না সীতাকে। সীতার ছেলেকে মনীষা সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। নিজে তার নাম রেখেছে প্রদীপ: তাকে নিয়েই সব সময়ে ভুলে থাকে মনীষা। ছেলের অযত্ন হ'লে মাঝে মাঝে রূঢ় হ'তেও দেখা গেছে তাকে। আর সীতা দেখাশোনা করে সাংসারিক সব কাজ। প্রদীপ মনীষাকে ডাকে 'মা' বলে। সীতাকে বলে 'ভাল মা'। এটা অবশ্য মনীষাই জোর করে আদায় করে নিয়েছে প্রদীপের কাছে।

অমিয় এ সবের কিছুই খেয়াল রাখে না। অমিয়র পরিচয়, সে একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তার বাবা হ'চ্ছেন রায়বাহাদুর হরিচরণ লাহেড়ী। জীবনভোর তিনি যা রোজগার করে গেছেন —তা সাধারণতঃ একটি মানুষের জীবনের সঞ্চয় হতে দেখা যায় না। অমিয়রা চার ভাই, তিন বোন। কিন্তু রায়বাহাদুর তাঁর মৃত্যুকালে একমাত্র সন্তান অমিয়কে রেখেই ইহলোক ত্যাগ করেন। সে কারণে বিচক্ষণ জীবানন্দ বাবু স্বর্গীয় রায়বাহাদুর হরিচরণ লাহেড়ীর পুত্র অমিয় লাহেড়ীর সঙ্গে মনীষার বিয়ে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারেননি। মনীষার আর যাই হোক কোনদিন অর্থকষ্ট হবে না, এই ধারণার বশেই জীবানন্দবাবু অমিয়র সঙ্গে মনীষার বিয়ে দিয়েছিলেন। অমিয়র অর্থের অনটন কোনদিনই হয়নি। পৈত্রিক টাকা ছাড়া ছবি বিক্রি করে অমিয়র যা আয় হয়—তা নেহাত মন্দ নয়। এই গত বছরেই অমিয় সর্বসমেত এগার হাজার টাকা শুধু ইন্‌কাম ট্যাক্স দিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন তার যাই হোক না কেন, শিল্পী হিসেবে সে আজ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত। অমিয়র শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায় তার ব্যবহারে। মানুষের সঙ্গে পরিচয় করে সে আনন্দ পায়। সঙ্গী হিসেবে অমিয় সকলেরই প্রিয়। যে একবার তার সংস্পর্শে এসেছে---তারই কাছে অমিয় দখল করে নিয়েছে তার প্রিয়জনের আসন।

সীতা আর মনীষার মধ্যে সে কোনো প্রভেদ রাখে না। বরঞ্চ সে মনীষাকেই সব সময় একটু প্রাধান্য দেয়। সীতা তা

বোঝে—কিন্তু, সে মনীষাকে সব সময় খুশি রাখার জন্য অমিয়র এই পক্ষপাতিত্বকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে।

প্রদীপের পর সীতার একটি মেয়ে হয়। এর নাম শিখা। মনীষার দেওয়া নাম। এরা মনীষার খুব আদরের। তার স্নেহের চরম প্রকাশ পায় এদের মধ্যে।

বেলা বেড়েছে তবু তারা খেলা করে সীতার সঙ্গে। মনীষা সকাল বেলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে বাংলা খবর। বাঙ্গালীর মেয়ে বাঙলার গ্রামের খবর পেলে তার মনটা সহজেই খুশিতে ভরে যায়। সে সংবাদ পড়লে একদিকে যেমন আনন্দ, অপরদিকে তেমনি তৃপ্তি। নেশার মধ্যে মনীষার খবরের কাগজ পড়া এক নেশা।

নবারুণ মনীষার বাড়ীর সামনে গাড়ী থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দেয়। গেটের ভেতর একটু ঢুকে তার নজর পড়ে সীতার দিকে। সীতার সঙ্গে প্রদীপ ও শিখা চমকে দাঁড়িয়ে যায়।

নবারুণ জিগেস করে ঃ এটা কি অমিয় লাহেড়ীর বাড়ী ?

সীতা উত্তর দেয় ঃ হ্যাঁ।

প্রদীপ ও শিখা এগিয়ে আসে নবারুণের কাছে।

দু'জনে একসঙ্গে জিগেস করে ঃ বাবাকে চাই ?

নবারুণ বলে ঃ হ্যাঁ। অমিয়বাবুকে।

প্রদীপ বলে ঃ আমার বাবা।

শিখা বলে ঃ না—আমার বাবা।

নবারুণ বিস্মিত হয়ে এদের দেখে। সীতা এগিয়ে এসে বলে ঃ তিনি বাড়ী নেই। গোয়ালিয়র গেছেন।

—গোয়ালিয়র ? কিন্তু আমি কলকাতা থেকে···।

মনীষার কানে কথাটা পৌঁছতে সে কাগজটা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলে : ভেতরে এসো নবারুণ।

নবারুণ অমিয়র এই রকম অন্তর্ধান আশা করেনি। বাড়ী নেই শুনে ভেবেছিল ফিরে যেতে হবে কোন এক হোটেলে। মনীষাকে দেখে তার স্বস্তি হোল। সুটকেসটা পাশে রেখে নবারুণ সামনের চেয়ারে বসে পড়ল।

মনীষার মুখে হাসি। সীতা, প্রদীপ, শিখা সকলেই এসে দাঁড়িয়েছে নবারুণকে ঘিরে।

মনীষাই প্রথমে বললে : তুমি যে ওঁর চিঠি পেয়ে এবার আসবে—তা আমি ভাবতেই পারিনি।

—কেন ? কপালের ঘাম রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে নবারুণ জিগেস করে।

মনীষা বলে : এর আগে আমিও অনেক চিঠি দিয়েছি। উনিও দিয়েছিলেন তোমাকে আসার জন্য অনুরোধ করে। কৈ, আসনি তো ? তাই বলছি।

—সময় পাই না। মোটেই সময় নেই।

মনীষা হাসতে হাসতে বলে : এখন তুমি বড়লোক। আমাদের মত গরীবের খোঁজ করবে কেন ?

—এ বড় পুরনো ডায়লগ মনীষা। নতুন কিছু বলো। গরীব, বড়লোক ইত্যাদি, সব কথা খুব বেশী ব্যবহার হ'য়ে গেছে। যাক্, অমিয় কোথায় ?

—কাল গোয়ালিয়র গেছে।

—বাঃ, বেশতো লোক! আমাকে আসতে বলে উধাও হ'য়ে গেল!

—বিশেষ এক জরুরী কাজে তাঁকে যেতে হ'য়েছে। তিনি নাই বা থাকলেন। আমরা তো রয়েছি।

প্রদীপ সীতার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে জিগেস করে: কে ভাল মা?

সীতা বলে: চুপ করো।

মনীষা তা লক্ষ্য করে। প্রদীপকে বলে: ইনি তোমাদের মামাবাবু হন। প্রণাম করো। প্রদীপ নবারুণের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

নবারুণ বাঁ হাত দিয়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে: এ কে মনীষা?

—আমার ছেলে।

—বাঃ! সুন্দর ছেলে! কৈ, তুমি তো কোনদিন চিঠিতে তা জানাও নি।

শিখা নবারুণের একটি পা ছুঁতে পেরেছে। আর একটি পা ছুঁতে তার কষ্ট হ'চ্ছে। কিন্তু সে ছোঁবেই। না ছুঁলে প্রণাম হয় না।

নবারুণ বলে: আরে থাক্, থাক্।

শিখা বলে: আপনার পা কোথায়? আমি যে খুঁজে পাচ্ছি না।

নবারুণ তাকে টেনে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিখা এবার

তার পা দেখতে পেয়েছে। জোর করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

নবারুণ শিখাকে আদর করতে করতে বলে: এটি বুঝি মেয়ে? বেশ—বেশ। কিন্তু মনীষা তোমার ছেলে মেয়েদের কথা তো মোটেই জানাওনি আমাকে। সীতা মুখ টিপে হাসে। তার বেশ কৌতুক মনে হয়।

মনীষা বলে: সীতা চায়ের জল চড়িয়ে দাও। সীতা চলে যেতে নবারুণ জিগেস করে: উনি কে?

শিখা বলে: আমাদের ভাল মা।

মনীষা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যেন অনিচ্ছুক। তাই অন্য কথা পাড়ার জন্য বললে: অচিরার কি খবর?

—ভালই আছে। খায় দায়, ঘুরে বেড়ায়।

—তোমার সেবাও করে।

নবারুণ বলে: আমার সেবা সে করে না। জনগণের সেবা করে। রাত্রি দিন সে ব্যস্ত সোস্যাল ওয়ার্কে।

মনীষা খবরের কাগজটা ভাঁজ করে একটা মোটা বই চাপা দিতে দিতে বললে: সংসারের চাপ নেই মোটে। প্রচুর অবসর থাকলে মন যে হাঁপিয়ে ওঠে।

—তা বটে।

প্রদীপ ও শিখা লাফাতে লাফাতে সীতার কাছে যায়। নবারুণকে তারা এই প্রথম দেখছে—তবু তাদের আনন্দের যেন সীমা থাকে না।

নবারুণ বলে: বেশ সুন্দর তোমার ছেলে মেয়ে দুটি।

এ না হ'লে কী ঘর মানায়! এত বড় খোলা জায়গা পড়ে রয়েছে। ছেলেরা তো রাত্রি দিন শুধু লাফালাফি করবে, খেলবে। আমার ভারী ভাল লাগে ছেলেদের দৌরাত্ম্যপনা দেখতে।

মনীষা হাসে। বলে ঃ তোমার কোনো ছেলেপুলে হয়নি?

না। খুব গম্ভীর হ'য়ে উত্তর দেয় নবারুণ।

মনীষা বলে ঃ তুমি আসতে কী যে আনন্দ হ'চ্ছে—তা তোমায় কী বলবো। তোমার মত আপনজন তো কেউ কখন আসেনি। কত বছর পরে দেখা। তোমাকে দেখতেও ভাল লাগে।

নবারুণ জিগেস করে ঃ অমিয় কবে ফিরবে?

—কয়েক দিনের মধ্যে।

—হঠাৎ গোয়ালিয়রে কি কাজ পড়লো?

—সঠিক জানি না। আজকাল তো প্রায়ই ওখানে যাচ্ছে। কোন এক বড় শেঠজী তাঁর পরিবারের সকলের ছবি আঁকাবে। মোটা টাকা আসারও সম্ভাবনা আছে।

সীতা ট্রেতে করে চা আর নিম্‌কি বিস্কুট নিয়ে এসে হাজির। সঙ্গে এক বোতল জেলি। এ ছাড়া এরই মধ্যে নবারুণের জন্য ফিস ফ্রাই এনেছে দু' পিস্। সীতা ট্রে-টা এনে রেখে দেয় টেবিলের ওপর। এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। ত্রস্ত হ'য়ে চলে যায় ভিতরে। নবারুণ বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে থাকে সীতার চলে যাওয়ার দিকে।

মনীষা চায়ের পেয়ালায় চা ঢেলে তৈরী করতে করতে বলে ঃ

নাও—খেতে সুরু করো। তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সারারাত্রি বোধ হয় জেগেই কেটেছে। ট্রেনে ঘুমও হয় না, অথচ ঢুলুনি আসে শুধু। ট্রেন হ'চ্ছে ঘুমের দেশ। ঘুমের আমেজ আনায়—অথচ ঘুম হয় না।

নবারুণ মুখে একটা নিম্‌কি বিস্কুট পুরে দিয়ে বলে: তোমার দেখছি বেশ অভিজ্ঞতা আছে।

মনীষা কিছুই বলে না। শুধু চেয়ে থাকে নবারুণের দিকে।

নবারুণ বলে: কি দেখছো?

মনীষা বলে: তোমাকে।

—আমাকে দেখার কি আছে? আমি কি তোমার কাছে নতুন হয়ে গেলাম নাকি?

—নতুন কেন হবে, পুরনো বলেই তো এত মন দিয়ে দেখছি। ভারী ভাল লাগছে তোমাকে নবারুণ।

—তুমি বিবাহিতা; তুমি সন্তানের জননী।

—আমি বিবাহিতা; কিন্তু জননী নই।

—সে কি?—এই যে বললে, তুমি প্রদীপ, শিখার মা।

—মা। নিজের মা নই।

নবারুণ বলে: তা হোক। তোমাকে তারা তো মা বলেই ডাকে।

—হ্যাঁ। কিন্তু মা হবার মত ভাগ্য পাই নি। মনীষার কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট বেদনার আভাস।

নবারুণ এক চুমুকে পেয়ালার চাটুকু শেষ করে ফেলে।

মনীষা উঠে দাঁড়িয়ে বলে: এসো ভেতরে, বাড়ীটা একটু

ঘুরে দেখো।

নবারুণ উঠে দাঁড়ায়। মনীষা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এক এক করে বাড়ীর সব কিছু দেখায়। দেখায় খাবার ঘর। সীতার ও তার পৃথক পৃথক শোবার ঘর। ষ্টুডিও—তার সংলগ্ন অমিয়র ঘর। ছেলেরা রাত্রে সীতার কাছে শোয়। রান্নাঘরটি অবশ্য ভারী সুন্দর। গোল পাতার ছাওয়া। বসার ঘরটি পরিপাটি করে সাজানো। অমিয়র তৈরী ছবি ছাড়া—বাঙালী ও বহু বিদেশী বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর ছবি টাঙানো রয়েছে। যামিনী রায় থেকে অমৃত শের গিল। সকলের উপস্থিতিতে মনে হয় যেন বাছাই করা চিত্র-শিল্পের প্রদর্শনী।' সীতার সঙ্গে নবারুণের আলাপ হয়। অত্যন্ত নম্র এই মেয়েটি—সহজে কথা বলে না। বয়সে সে মনীষার চেয়ে ছোট হবে বছর তিন চারেকের। প্রতি কথায় সে হাসে। হাসলে মুখটা সত্যি খুব ভাল দেখায় সীতার।

নবারুণের থাকার ব্যবস্থা হ'লো ষ্টুডিওর সংলগ্ন ঘরে। তাকে বিশ্রাম করতে ব'লে মনীষা চলে গেল। ঘরটি এক সময় বেশ পরিপাটি করে সাজানো ছিল। এখন এত অগোছাল যে, তা বলা যায় না। সীতা তাদের বৃন্দাবন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে এসে বিছানার নতুন চাদর পালটে দেয়। ডাষ্টার দিয়ে পরিষ্কার করে দেয়—টেবিল, চেয়ার, আর বুককেসটা। পুরনো খবরের কাগজ ও সিগারেটের ছাই-এর টুকরোতে কী নোংরা না হ'য়েছিল মেঝেটা। সীতা বৃন্দাবনকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে দেয়।

সীতা নবারুণকে বলে : এবার আপনার আর অসুবিধা হবে না।

—আমার কিছুতেই অসুবিধা হয় না।

সীতা এবার বৃন্দাবনকে বললে : দিদিকে ডেকে দে বৃন্দাবন —দরকার আছে।

বৃন্দাবন চলে যায়।

নবারুণ এবার নিজে থেকেই জিগেস করে : মনীষা আপনার কি সম্পর্কে দিদি ?

সীতা মৃদু হেসে বলে : দিদি। এইটেই বড়ো সম্পর্ক নয় কি ?

—তবু।

—তবু আর কিছুই নয়। সীতার মুখে সেই হাসি। নবারুণ এবার অবশ্য কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে সীতা আর মনীষার সম্পর্কটা কী। তবু স্পষ্ট জানতে না পারায় মনে যেন স্বস্তি পায় না।

সীতা বললে : তবে শুনুন। আমি এ বাড়ীর আশ্রিতা। দিদি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর কথা মতই আমি চলি। দিদির কোনো কথাই আমি অমান্য করি না।

বাইরের আকাশে জোলো মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামার আভাস পাওয়া যায়। মেঘ ডাকছে—মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে এলোমেলো করে দিচ্ছে টেবিলের ওপরের কাগজগুলো।

সীতা দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের জানলাগুলো বন্ধ করে দেয়।

অন্ধকার করে আসছে চারিদিক।

নবারুণ বলে: আপনার ছেলে মেয়ে দুটি গেল কোথায়? ভারী সুন্দর ওরা। কী মিষ্টি চেহারা।

সীতা বলে: ওরা তো আমার ছেলে মেয়ে নয়। ওরা দিদির।

নবারুণ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সীতা ও মনীষা দুজনেই নিজেরা স্বীকার করতে চায় না প্রদীপ শিখার মা ব'লে। কী যেন একটা রহস্য রয়ে গেছে এর মধ্যে। সীতার মুখের সঙ্গে শিখার মুখের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। নবারুণ শুধু ভাবে। কোনো কথাই বলে না। সীতা চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। দু'জনের মধ্যে অনেকক্ষণ কোন কিছু কথা হয় না।

সীতা বললে: আপনি বিশ্রাম করুন, আমি দিদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নবারুণ কিছু বলার আগেই সে ঘরের বাইরে চলে যায়। সীতার কথায় নবারুণের মনে দৃঢ় ধারণা হ'য়ে যায় যে অমিয় একটি স্ত্রী-কে নিয়ে খুশি হ'তে পারেনি। সীতাকে আনার প্রয়োজন বোধ করেছিল বলেই তাকে এনেছে। কি আশ্চর্য, মনীষা তা মেনে নিল কি করে! সাধারণতঃ মেয়েরা কিছুতেই তা সহ্য করতে পারে না। অথচ এরা একটি স্বামীকে নিয়ে খুশিতেই আছে। কোনো কলহ নেই, কোন সংঘর্ষ নেই। মনীষাকে দেখে তো বোঝাই যায় না সে অসুখী। স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধাও আছে যথেষ্ট। অথচ সীতাকে সে ঈর্ষাও করে না। এ

কী করে সম্ভব হয়! না—না, মনীষার মনে গভীর ক্ষত আছে। সে আজ তা প্রকাশ করতে পারছে না। আর তা ছাড়া নবারুণের কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়লে মনীষার তো লজ্জার আর সীমা থাকবে না। মেয়েদের অহঙ্কার হ'চ্ছে—স্বামী। স্বামীর ভালবাসা বা অনুরাগ থেকে যদি কোনো মেয়ে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়—তবে তার মত দুঃখী আর কে আছে? নবারুণ এ তো কল্পনাও করতে পারেনি কোনদিন। মনীষার দুঃখের কথা ভেবে তার মনটা যেন আরো মুষড়ে পড়ে। অথচ কী আশ্চর্য, মনীষা ও সীতা দুজনেই হাস্যমুখী। তাদের একজনের না একজনের নিশ্চয় গভীর দুঃখ আছে। কিন্তু কেউই তা প্রকাশ করে না। এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। এইটেই সবচেয়ে বেদনাদায়ক।

ইজি-চেয়ারে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে নবারুণ চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে এই সব ভাবে।

মনীষা এসে ঢোকে ঘরে। নবারুণ ক্লান্ত। অবসন্ন দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘুমচ্ছে দেখে ডাকতে সাহস পায় না মনীষা। কিন্তু তার পায়ের আওয়াজে নবারুণ চোখ চেয়ে দেখে।

মনীষা বলে: আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমোচ্ছ। তাই ডাকতে সাহস করিনি।

—ঘুমোইনি। চোখ বুজে ভাবছিলুম।

—কি আবার তোমার ভাবনা হ'লো? মনীষা মৃদু হেসে জিগেস করে।

—অনেক কিছু। হাই তোলে নবারুণ।

মনীষা ইজি-চেয়ারের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললে : তোমার আবার কিসের ভাবনা ? অচিরার কথা বোধ হয় ?

—না। মুখটা শক্ত হ'য়ে যায় নবারুণের।

মনীষা যেন খুব একটা কৌতুক করতে পেরেছে। জোরে হেসে ওঠে।

নবারুণ, তার হাসি থেমে যেতে বললে : একটা কথা বলবে মনীষা ?

—নিশ্চয় বলবো।

—সীতার বিষয় আমাকে সত্যি কথা বলো।

মনীষার মুখের বেশ পরিবর্তন দেখা যায়। তবু মুখে হাসির ভাব এনে সে বললে, সীতা হ'চ্ছে মিসেস অমিয় লাহেড়ী।

নবারুণ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। বিস্মিত হ'য়ে আবার জিগেস করলে : বিবাহিতা স্ত্রী ?

—হ্যাঁ।

—তুমি কিছু বলোনি ?

—না।

—তোমাকে তোমার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করলো—আর তুমি তা চুপটি করে মেনে নিলে কেন ?

মনীষা বললে : না—না, আমার প্রাপ্য থেকে কেউই আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আমি একা থাকি ব'লে সীতাকে উনি এনে দিয়েছেন। আমি তো খুব সুখী, আর সীতা

যে অসুখী নয় তা আমি জোর কোরে বলতে পারি।

—এ তোমার কি কথা মনীষা ?

মনীষা জোর দিয়ে বললেঃ এই আমার মনের কথা। দোহাই নবারুণ, তুমি আর যাই করো—সমবেদনা জানিও না। আমি বলছি—আমি খুব সুখী। অমিয় লাহেড়ীকে দেখেই আমার মা বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাকেই অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চাই। কারুর অনুগ্রহ, কারুর সহানুভূতি আমি চাইনে—আমি চাইনে নবারুণ। মনীষার চোখে জল দেখা না গেলেও, চোখ তার ছল ছল করছিল।

তারপর নবারুণের সঙ্গে এ বিষয়ে মনীষার আর কোন কথা হয়নি। প্রদীপ আর শিখা আসতে কথার মোড় গেল ঘুরে। পাখি, ভাল্লুক আর বাঘের গল্প সুরু হলো। অবাক হোয়ে শোনে প্রদীপ আর শিখা। শিখার আর আনন্দের সীমা থাকে না।

বিকেলে ছেলেদের নিয়ে মনীষা আর নবারুণ গেল সমুদ্রের ধারে বেড়াতে। বাড়ীতে রইল সীতা। ছেলেরা এক ধারে ব'সে বালি নিয়ে মন্দির, আর ঘর তৈরী করছে। তাদের সঙ্গে জুটে গেল আরো অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে।

নবারুণ আর মনীষা পাশাপাশি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে লাগল। অনেকক্ষণ তারা বেড়াল—কিন্তু খুব অল্প কথাই তাদের মধ্যে হলো। মাঝে সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে—তাদের পায়ের খুব কাছে। ঢেউ-এর সে কী ব্যাকুল আর্তনাদ! মনে

হয় নবারুণের, ঢেউ-এর সঙ্গে জীবনের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে।

মনীষা নিজে থেকেই সুরু করলে ঃ কেন মিছে আমার কথা ভেবে দুঃখ পাচ্ছ? যে কদিন এসেছ আনন্দ দিয়ে যাও। সেই হবে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়।

নবারুণ তবু বললে ঃ তোমার দুঃখ দেখব বলেই কি এখানে বেড়াতে এলাম? এ তো আমি চাইনে মনীষা।

মনীষা যেন জোর করে হাসে। সে বললে ঃ তুমি খুব ভুল করছো। আমি আমার স্বামীকে নিয়ে খুব সুখী। কেন মিছি-মিছি এইসব ভেবে নিজে কষ্ট পাচ্ছ'। সেদিন নবারুণের মনের মেঘ কিছুতেই কাটল না। আরো বিষণ্ণ হ'য়ে গেল—তাদের ফেলে-আসা দিনগুলির কথা ভেবে। অনেক রাত্রি অবধি তারা সমুদ্রতীরে বসে একদৃষ্টে চেয়েছিল সমুদ্রের দিকে।

॥ আট ॥

ষ্টুডিওর সংলগ্ন ঘরটিতে নবারুণের থাকার ব্যবস্থা হয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সীতা আর মনীষা বসে বসে গল্প করে নবারুণের সঙ্গে। কত গল্প—। এতদিনকার যত কিছু সঞ্চিত ছিল—সবের গল্প হ'লো। কত হাসি ঠাট্টায় খানিকটা সময় বেশ কেটে গেল। সীতার গলা খুব মিষ্টি। মনীষার অনুরোধে গান করলো

সীতা। রবি ঠাকুরের গান। সীতার কণ্ঠে অপূর্ব সুর সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্র সংগীতের ধারাই আলাদা। শুধু গলায় এত মিষ্টি লাগে যে মন খারাপ হ'য়ে যায়। খানিকটা সময় ভাবতেই কেটে যায়। সীতা গায়ঃ

এই লভিনু সঙ্গ তব
সুন্দর, হে সুন্দর
পুণ্য হল অঙ্গ মম
ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর।
এই তোমারি পরশ রাগে
চিত্ত হল রঞ্জিত
এই তোমারি মিলন-সুধা
রইল প্রাণে সঞ্চিত। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সীতার গান থেমে যাবার অনেক পরে মনীষাই প্রথম কথা বললেঃ সর্বকালের সর্বসময়ের আবেদন আছে রবি ঠাকুরের গানে। তাই তো তিনি বিশ্ববরেণ্য।

নবারুণ বললেঃ কথা আর সুর নিয়ে এককালে বাঙলা-সাহিত্যে তুমুল আলোড়ন হ'য়েছিল। এক দল ছিল কথার পক্ষে —আর একদল সুরের।

মনীষা বললেঃ শেষে কাদের জিত হলো?

নবারুণ একটু স্মিত হেসে বললেঃ এর সঠিক কোন সিদ্ধান্তে কেউই আসতে পারেনি। আমি তো জানি রবি ঠাকুর স্বয়ং তাঁর

মত জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ কথা ও সুর দুটো পরস্পরে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটার গুরুত্ব খুব অল্প। এই দুটোর মধ্যে বেশ একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে। আসল কথা কী জানো, গান হচ্ছে কথা ও সুরের ব্লেণ্ডিং। দু'টোরই ভাগ আছে। যে কোন একটা বেশী হ'লে —তুবড়ীর অবস্থা হবে। জ্বলবে—ফুল কাটবে না। আর হয়ত একটু জ্বলার পর ফেটে যাবে।

মনীষা ও সীতা এতক্ষণ নবারুণের কথাই শুনছিল। মনীষা বললে ঃ রবিঠাকুর ছিলেন গানের উপাসক। তাঁর সৃষ্টি হ'চ্ছে গান। তাঁর আশঙ্কা ছিল একশো বছর পরে তাঁর নাম বেঁচে থাকবে কি থাকবে না। তার প্রধান কারণ—তিনি খাঁটী গীতিকার ছিলেন। কালের স্রোতে সবই ধুয়ে মুছে যাবে—শুধু বেঁচে থাকবে গান। রামপ্রসাদ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মীরাবাঈ, চন্দ্রাবতী —এঁরা সবাই হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকবেন। রবীন্দ্র সংগীতও বহুদিন বেঁচে থাকবে, অবশ্য যতদিন বেঁচে থাকবে বাঙলার নিজস্ব কৃষ্টি ও ঐতিহ্য।

সীতা এসব আলোচনা শুধু শুনেই যায় চিরকাল। কোনোদিন কিছুই মন্তব্য করে না। আজ হঠাৎ তার কণ্ঠস্বরে জীবন-বেদের আভাস পাওয়া গেল। সীতা বললে ঃ সংগীত হ'চ্ছে জীবনের প্রধান সম্পদ। সংগীতের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের অভিব্যক্তি হয় সহজ ও স্পষ্ট। দুঃখ, হতাশা, বেদনা, প্রেম, ভালবাসা, আনন্দ, আবেগ—সবকিছুরই সুষ্ঠু প্রকাশ হয় সংগীতে।

নবারুণের ভাল লাগে সীতার কথাগুলো। এত ভাল করে সে কথা বলতে পারে—তা নবারুণ বিশ্বাসই করতে পারে না। অমিয় শিল্পী। সে সুন্দরের উপাসক। নিজের জন্য সে যে ফুল চয়ন করবে—তা নিশ্চয়ই ভাল হবে। সেই ফুলটির রূপ আর গন্ধ অন্য যে কোন ফুলের চেয়ে নিশ্চয় বেশী হবে। মনে মনে আরো কত কী ভাবে নবারুণ।

অমিয়র শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায় সীতাকে দেখে। সীতা সুশ্রী, কিন্তু সুন্দরী নয়। অপূর্ব এক লাবণ্য আছে তার চেহারায়। কিন্তু নবারুণ কিছুতেই বুঝতে পারে না—অমিয় কী করে একই সঙ্গে সীতা ও মনীষাকে ভালবাসে? একই সঙ্গে দুটি মেয়েকে সমান ভাবে ভালবাসতে পারার মধ্যে যথেষ্ট মনের প্রসারতা থাকার প্রয়োজন। অমিয়র তা আছে বলেই—সীতা ও মনীষার মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, ঈর্ষা নেই, কলহ নেই। মনীষা হচ্ছে অমিয়র প্রেরণা, সীতা হ'চ্ছে তার মনের অভিব্যক্তি। তাই স্টুডিওর দেয়াল ভর্তি সীতার নানা ভঙ্গীমায় আঁকা ছবি। অমিয়র দৃষ্টিভঙ্গীটা ভাল। ছবিগুলো দেখলেই—তা বোঝা যায়। চাঁদকে আড়াল করে মেঘেরা যেমন ভাবে লুকোচুরি খেলে—অমিয় তেমনি ভাবে সীতাকে বসিয়ে ছবি এঁকেছে। এক সঙ্গে এত রঙের আঁচড়—এমন নিখুঁত ভাবে লাগাতে আর কারুকে দেখা যায় না। এইখানেই সার্থক অমিয়র শিল্প। এইখানেই তার মনের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

মনীষার চোখ ঘুমে বুজে আসছে। সীতা বললে: দিদি,

শিবরাত্রে অনেককে তোমার মত ঢুলতে দেখেছি। মেয়েরা উপোস করে থাকে অথচ ঘুমোতে চায় না। চল্‌তি কথায় বলে —শিবঠাকুর এসে পা টিপবে। পাপের ভয়ে রাত জাগার সে কী অদম্য ইচ্ছা। তোমার জেগে থাকা দেখে পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ছে।

মনীষা সব কথা বোধ হয় ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারে না। তাই তার কথায় সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। মনীষা বলে ঃ আমার তো সেই পাপেরই ভয়। ঘুমোলে যদি শিবঠাকুরের রাগ হয়।

এই কথায় নবারুণের বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। সীতার মনে পাছে কোন সন্দেহ জাগে তাই ভেবে নবারুণ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে ঃ মনীষাকে আপনি নিয়ে যান। ঘুমের ঘোরে এলোমেলো কী সব বকছে।

মনীষা সজাগ হ'য়ে ওঠে। বলে ঃ না—না ঘুমোইনি, একটু তন্দ্রা এসেছিল।

সীতা বলে ঃ স্বয়ং কুম্ভকর্ণ দিদির সহায়। একবার ঘুম ধরলে দিদির আর কোনো সাড় থাকে না।

সীতার ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মনীষাও উঠে দাঁড়ায়। যাবার সময় মনীষা কিছু বলে না। সীতা শুধু বললে ঃ নতুন জায়গায় আপনার বোধ হয় ঘুমের অসুবিধা হবে। ও পাশের জানলাটা খুলে দিন। হাওয়া পাবেন খুব। যদি রাত্রে কোনো কিছুর অসুবিধা হয়—তবে দালানে বৃন্দাবন থাকবে—তাকে ডাকবেন।

আজকের মত আমরা আসি। শুভরাত্রি জানাচ্ছি। আবার কাল সকালে দেখা হবে।

সীতা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

রাত্রে সত্যি সত্যি নবারুণের মোটেই ঘুম এলো না। অনেক রাত অবধি বিছানায় শুয়ে সে ছট্‌ফট করতে লাগল। কত চিন্তা! অতীত আর বর্তমানের সংঘর্ষ। মনীষা ও অচিরার মধ্যে পার্থক্য, ইত্যাদি। নানা চিন্তায় সারা রাত্রি ধরে তার মনের ওপর চলেছে দৌরাত্ম্য। ভোরের দিকে নবারুণ ঘুমিয়ে পড়েছিল। দরজা, জানলা সব খোলা। শিশুর মত সে ঘুমোচ্ছে বিছানার একপাশে।

ভোর বেলা চায়ের ট্রে নিয়ে সীতাই একা এসেছে নবারুণের ঘরে। চায়ের ট্রে-টা বিছানার সামনে টিপয়ের ওপর রেখে সীতা নবারুণকে ডাকতে লাগল ঃ শুনছেন, চা এনেছি। সকাল হ'য়েছে, উঠুন। শুনছেন···। নবারুণের শোনার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে সীতার সাহস হয় না। যদি কিছু মনে করে নবারুণ। গায়ে ধাক্কা না দিলে কী ঘুম ভাঙ্গে!

সীতার কী রকম যেন অপ্রস্তুত ভাব। সীতা তবু ডাকে দূর থেকে ঃ শুনছেন—চা এনেছি, উঠুন। সীতার ডাক বোধ হয় নবারুণের কানে পৌঁছায়। নবারুণ চোখ চেয়ে দেখে সামনে সীতা দাঁড়িয়ে। সে বলে ওঠে ঃ এ কি অপনি?

সীতা মাথা নীচু করে বলে ঃ হ্যাঁ, চা এনেছি।

নবারুণ বললে ঃ সকাল হ'য়ে গেছে।

দু' হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে নবারুণ উঠে বসে। তারপর বললে ঃ আমার খেয়াল নেই। আমার মনে হ'চ্ছিল এখনো বুঝি রাত আছে।

সীতার ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে।

—মনীষা বুঝি এখনো ঘুমোচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

সামনের চেয়ারে বসে সীতা চা তৈরী করে। দু' পেয়ালা চা তৈরী করে সীতা একটি এগিয়ে দেয় নবারুণের দিকে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে নবারুণ জিগেস করল ঃ আমি যে খুব সকালে চা পছন্দ করি—এ কথা আপনি জানলেন কি করে ?

—দিদির হুকুম ছিল।

নবারুণ বললে ঃ মনীষা তা হ'লে এখনো সব ভোলে নি ? জানেন, খুব ছোট বেলা থেকে মনীষাকে আমি জানি। ছোট বেলায় আমিই ছিলুম ওর একমাত্র সঙ্গী। আমাদের দু'জনে এত ভাব ছিল যে, তা আর বলা যায় না। একই স্কুলে আমাদের শিক্ষা। কিন্তু, ওর আর আমার পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কী যেন বলতে গিয়ে নবারুণ নিজেকে সংযত করে নেয়। খেয়াল থাকে না ওর বলার সময়। বিশেষতঃ মনীষার কথা।

সীতা নবারুণের কথার ধরন দেখে কিছুটা ওদের বিষয় অনুমান করে নেয়। কিন্তু এ আলোচনা তো তার করা ভাল দেখায় না। হোক না অপূর্ণ প্রেম, হোক না তা ব্যর্থ—তবু সীতা জানলেও তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করা মোটেই শোভন নয়।

সীতা বলে : দিদির কাছ থেকে আপনার কথা অনেক শুনেছি। শুনেছি, আপনি নিজের চেষ্টায় বড় হ'য়েছেন। ছোট বেলা থেকেই আপনাকে বহু কষ্ট করতে হ'য়েছে। আচ্ছা—একটা কথা জিগেস করবো কিছু মনে করবেন না ?

—কি কথা ? কিছুই মনে করবো না।

সীতা একটু যেন ইতস্ততঃ করে কথাটা তুলতে। নবারুণের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে বলে ফেলে।

—শুনেছিলাম, আপনার মা ও ভাই-বোনেরা আছেন।

—একদিন ছিল আজ আর নেই। আমি বিলাতে থাকা কালে মা মারা যান। ফাদার সিমন্স ব'লে আমাদের এক পাদরী এককালে খুব সাহায্য করেছিলেন। তাঁর চিঠিতেই আমি জেনেছিলাম মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মা আমার চিরদিন দুঃখ পেয়েই গেলেন। সুখের যখন পত্তন হলো—তখন আর মাকে খুঁজে পেলাম না। আমার পরিবারের সকলে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। শুধু একটি ভাই বেঁচে আছে। সে থাকে সিঙ্গাপুরে। মাঝে মাঝে টাকার দরকার হলে চিঠি লেখে। বহুকাল তাকেও দেখিনি। ইচ্ছে হয় দেখতে—কিন্তু দেখার সুবিধে নেই।

এতক্ষণে মনীষা এল ঘরে। চোখে তার ঘুমের আমেজ রয়েছে। মনীষাকে দেখে সীতা বললে : দিদি, তোমার হুকুমে খুব ভোরে হাজির হ'য়েছি। উনি তো অবাক আমাকে দেখে। দিদি, তুমি একটু চা···

মনীষা বলে ঃ তোমার চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। আমি বৃন্দাবনকে জল দিয়ে যেতে বলেছি।

প্রদীপ ও শিখা আসে মনীষার একটু পরে। নবারুণ শিখাকে নিয়ে একটু আদর করে। শিখাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে বলে ঃ তুমি কোথায় ছিলে শিখারাণী। তোমার জন্যে আমি চকলেট রেখেছি। নবারুণ বালিশের তলা থেকে চকলেট বার করে শিখা ও প্রদীপকে দেয়।

মনীষা নবারুণের বিছানার এক পাশে শুয়ে পড়ে বলে ঃ কৈ, আমাদেরও দাও।

—খাবে তোমরা ?

সীতা বলে ওঠে ঃ না—না। কী যে বলো দিদি।

মনীষা বললে ঃ তোমাকে জব্দ করতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল, তাই বললাম।

নবারুণ হাসতে হাসতে বললে ঃ আমার সুটকেস ভর্তি চকলেট। ঐটে আমার বদ-অভ্যাস বলতে পারো। শিখা অবাক হ'য়ে যায় নবারুণের কথায়। সকলেই সেটা লক্ষ্য করে। নবারুণ শিখাকে আবার বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে ঃ তুমি আর একটা নেবে ?

শিখা বলে ঃ না।

নবারুণ শিখাকে আদর করে আবার চুমু খায়। শিখার মুখের দিকে তাকিয়ে সীতার দিকে তার চোখ পড়ে যায়। মা ও মেয়ের এক রকম মুখ। কিন্তু কেন জানি না সীতা লজ্জা পায়।

নবারুণের সঙ্গে চোখ চাওয়া-চায়ি হ'তে লজ্জা পায়। মনীষার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে ঃ আমি এদের নিয়ে একটু ঘুরে আসি দিদি। রেলা হ'য়ে গেলে রোদ উঠে পড়বে।

মনীষা যাওয়ার সম্মতি দেয়।

সীতা, প্রদীপ ও শিখাকে নিয়ে চলে যায় ঘর থেকে।

নবারুণ বলে ঃ তোমাদের দুজনের মধ্যে বেশ একটা মিল আছে। সাধারণতঃ মেয়েদের মধ্যে এ ভাব দেখা যায় না।

মনীষা বলে ঃ এটা আমার অর্জিত। শ্রদ্ধা অর্জন করতে হয়। দাবী জানালে ফল হয় বিপরীত।

নবারুণ বলে ঃ কাল আমি চলে যাবো মনীষা।

—কেন ? ব'লে মনীষা উঠে বসে।

আমাকে আসার জন্য যে নিমন্ত্রণ করেছিল, সে যখন নেই—তখন আর এখানে থাকা আমার ভাল দেখায় না।

তোমাকে জোর করে রাখার আমার কোনো অধিকার নেই। তবু বলছি—যখন এসেছ তখন ক'দিন থেকে গেলে ভাল হয়।

—অমিয় নেই বলেই আমার সঙ্কোচ হ'চ্ছে।

—তোমার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই। এ বাড়ীর ওপর আমারও কিছু অধিকার আছে।

—মনীষা, একটা সত্যি কথা বলবে ?

—আমি যা বলি তা সত্যি বলি। যা বলার নয় তা বলি না।

—তোমার একটা গভীর দুঃখ আছে। সীতাকে তুমি গ্রহণ করেচ অমিয়কে শাস্তি দেবার জন্য। তোমাকে দেখলে মনে হয়

তুমি খুব অসুখী। তাই না?

—না। খুব দৃঢ়স্বরে বলে মনীষা, আমি সুখী। আমার স্বামী আমাকে আমার কোনো অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি। সীতাকে নিয়ে যদি আমার স্বামী সুখী হয়—তবে আমার উচিত নয় তার বিরোধিতা করা। আর তা ছাড়া বেচারী সীতার অপরাধ কোথায়?

মনীষার গলার স্বর ভারী শোনায়।

নবারুণ কথার মোড় ঘোরানোর জন্য বললে: আমাকে ভুল বুঝো না মনীষা। যাক্ ও কথা। তোমার কাছে এসেছি শান্তি ও আনন্দ পাবার জন্য। দেখো, তুমি যেন রুষ্ট হোওনা।

এদের যখন কথা চলছে—তখন বৃন্দাবন এসে এক পট্ লিকার রেখে যায়। মনীষা দু'টি পেয়লায় চা ঢেলে তৈরী করে ফেলে—একটা এগিয়ে দেয় নবারুণের দিকে, আর একটা নেয় নিজে।

এবার বোধ হয় মনীষার বলার পালা। তাই সে নতুন পুরোনো অনেক কথাই বলে যায়। নবারুণ তা একমনে শোনে। নিজের কোনো মতামত প্রকাশ করে না।

॥ নয় ॥

আজ কয়েক দিন হলো নবারুণ এসেছে। হাসি আনন্দ ও গল্পে কয়েকটা দিন কেটে গেল। অচিরাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নবারুণ, তা অক্ষরে অক্ষরে সে পালন করতে পারেনি। তবে চিঠি সে দিয়েছে এবং উত্তরও তার এসেছে। এদিকে অমিয়র কোনো খবর না পাওয়ায় এরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। গোয়ালিয়র পৌঁছে অমিয় একটা চিঠিও দেয়নি। পৌঁছনোর সংবাদ পেলে এরা অবশ্য এতটা চিন্তিত হ'য়ে পড়ত না।

নবারুণ ষ্টুডিওর ছবিগুলো ভাল করে দেখে। যদিও জিনিস পত্তর চারদিকে ছড়ানো, ধূলোয় সব ময়লা হ'য়ে রয়েছে, তবুও যেন ভাল লাগে দেখতে নবারুণের। চারদিক দেখলে বেশ একটা শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। অমিয় আর যাই হোক, সে জাত শিল্পী। শিল্পকলার মধ্যে তার মৌলিকত্ব আছে। অমিয়র কথা ভাবতে ভাবতে নবারুণের মনে পড়ে পিকাসোর কথা। পিকাসোর ছবি হ'চ্ছে আত্মকেন্দ্রিক শিল্পীর ব্যঞ্জনাহীন অভিব্যক্তি। রূপ নেই, গন্ধ আছে। বক্তব্য যেন অস্পষ্ট রয়ে গেল। ছবির রূপ নেই, গন্ধ আছে আবার কি ? ছবিতো আর ফুল নয় ! আসল কথা হ'চ্ছে পিকাসোর ছবি ফুলের মত জীবন্ত। বর্ণাঢ্য নেই অথচ ভাব আছে। পিকাসোর আঁকা শ্বেত কপোত দেখে দুনিয়ার লোক বলে উঠলো বাহবা—বাহবা !

এ দেশের একজন শিল্পীকে আমি জানি, যিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব টেকনিকে ছবি আঁকেন। বর্ণাঢ্য নেই, ভাব আছে। ভাবের

অভিব্যক্তি তুলির আঁচড়ে প্রকাশ করার সুন্দর একটা ধারা আছে তাঁর। কিন্তু দুর্ভাগ্য তিনি পিকাসোর দেশে জন্মাননি। পিকাসোর দেশে জন্মালে বিশ্ববরেণ্য শিল্পী বলে স্বীকৃত হতেন। সেই শিল্পীর আঁকা শ্বেত কপোত শিল্পীমনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবি। কৈ বাঙলার সীমানা ছাড়িয়ে অন্য রাজ্যে তো তাঁর ঢাক বেজে উঠলো না? নবারুণ মনে মনে হাসে আর বলে: তিনি বাঙালী। বাঙলার মাটি আর জলের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। জীবনের জয়গান তিনি গেয়েছেন তুলির আঁচড়ে। তাঁকে পিকাসোর উঁচু আসন দিলে তো প্রগতিবাদী হওয়া যায় না। আমাদের দেশের রীতি হ'চ্ছে—বিদেশ থেকে স্বীকৃতি না পেলে বড় শিল্পী বলে মেনে নিতে কিছুতেই মন চায় না। অনেকে তাঁকে পাগল বলে উপহাস করেন। যদি তিনি পাগল হবেন, তবে তাঁর কাছ থেকে সার্থক শিল্পসৃষ্টি কি করে সম্ভব হয়? সৃষ্টির আনন্দে এঁরা বিভোর হয়ে থাকেন। সাধনাই এঁদের মহৎ শিল্পী হ'তে সাহায্য করে।

অমিয়র বিষয়ও সেই কথা প্রযোজ্য। ষ্টুডিওর ঘরে বসে আরো অনেক কথা মনে পড়ে নবারুণের। এ পাশে একটা তাকে কয়েকটা রয়েল একাডেমির গেজেট রয়েছে। আরো কয়েকটা—ইটালীর আর্ট জার্নাল। ধুলো পড়ে নোংরা হয়ে রয়েছে। একটা পাতলা এক্সসাইজ বুক পড়ে রয়েছে দেখে নবারুণ সেটা তুলে নেয়। দেয়ালে ঠুকতে কিছু ধুলো ঝরে পড়ে। একটু পরিষ্কার হ'য়েছে মনে হয়। মলাট ওলটাতে সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে

লেখা রয়েছে 'ঝরাপাতা'। এ কি উপন্যাস? না বড় গল্প? লেখাটা খুব পরিচিত মনে হয় নবারুণের। মনীষারই লেখা। কৌতূহল হয় নবারুণের। সেটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে তার থাকবার ঘরটিতে।

বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে শুয়ে পড়তে সুরু করে নবারুণ। কয়েক লাইন পড়তেই তার পরিষ্কার হয়ে যায়—এ মনীষার আত্মকথা। প্রথম কয়েকটি পাতায় স্পষ্ট দেখা যায়—উপন্যাসের আকারে সুরু করেছে মনীষা তার বাল্যজীবনী। ছোট খাটো ঘটনাগুলিতে নবারুণের চোখে ভেসে ওঠে, অতীতের স্মৃতি বিজড়িত বহু কাহিনী। চলচ্চিত্রের মত মনের পর্দায় প্রতিফলিত হয়—সেই সব কাহিনী, যা তারও স্মৃতিপটে কবে বিলীন হয়ে গেছে।

নবারুণ পড়তে থাকে ঃ

"আমার জীবনে বহু ছেলেই এসেছে। বহু ছেলেই আমাকে গোপনে জানিয়েছে তাদের ভালবাসা। কিন্তু আমি মন দিয়ে ভালবাসতাম একজনকে, তার নাম অরুণ। অরুণ আমার কৈশোরের বন্ধু। জীবনের প্রারম্ভে আমি তাকে আমার নিজের করে পেয়েছি। অরুণকে দেখলে আমার ভাল লাগতো। তার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগতো। তার কাছে গেলে আমার মনে হতো আমি যেন স্বর্গ জয় করে ফেলেছি। কি যে সে আনন্দ হতো—তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন ভালবাসা মানুষকে একেবারে অন্ধ করে ফেলে। আমার

জীবনেও সে সময় এসেছিল। একদিন অরুণকে দেখতে না পেলে মনে হতো পৃথিবী যেন অন্ধকার। হৃদয় যেন মরুভূমির মত শুষ্ক।"

পর পর কয়েকটি পাতা উল্টে নবারুণ আবার পড়তে সুরু করে ঃ

"অরুণকে বিয়ে করলে আমি সুখী হতাম। মনে মনে তাকে আমি স্বামী হিসাবে কল্পনা করে এসেছি। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে আমি শুধু সেই মূর্তির ধ্যান করে এসেছি। কত বসন্ত কেটে গেছে—একান্ত গোপনে শুধু আমি অপেক্ষা করেছি অরুণের জন্য। অরুণ আর আমি ঘর বাঁধবো। আমাদের জীবনে থাকবে শান্তি। কিন্তু কেন জানি না আমি লক্ষ্য করেছি—অরুণ যেন একটু পিছিয়ে গেল। সমাজের সকল বন্ধনকে উপেক্ষা করে বিয়ে করবো বলে মনস্থ করেছিলাম, কিন্তু আমার সে আকাঙ্খা আর কোন দিন পূরণ হলো না। শেষে একদিন আমি আমার মা বাবার নির্দেশ মত বিয়ে করলুম একজনকে। তিনি সাধারণ মানুষ নন। শিল্পীর সব কিছু তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছি। প্রথম প্রথম আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি—তাঁকে ভালবাসতে, কিন্তু পারিনি। অরুণের কথাই সব সময় আমার মনে পড়ে। অরুণকে যে আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসতাম। তাই স্বামীর প্রাপ্য থেকে যেন আমি তাঁকে সব সময় বঞ্চিত করছি ব'লে, আমার মনে কী রকম যেন অনুশোচনা হতো।

স্বামীকে জোর করে ভালবাসতে চেষ্টা করেছি—পারিনি। বিয়ের প্রথম প্রথম স্বামী আমাকে নিয়ে দেশবিদেশ ঘুরেছেন। স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর যা প্রাপ্য তাও সম্পূর্ণ না পেলেও আমি আংশিক পেয়েছিলাম। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক আমার স্বামী আমাকে অপছন্দ করতে লাগলেন। তিনি সব সময় কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন। যে বয়সে মেয়েরা স্বামীকে পেয়ে জীবনকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে, নতুন স্বপ্নে দিশেহারা হয়ে ওঠে, ঠিক সেই বয়সে আমি অনুভব করেছি—আমার স্বামীর আমাকে এড়িয়ে চলার সে কী এক অভিনব প্রচেষ্টা।"

"এই সব দেখে আমার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। কেঁদেছি নির্জনে আমি অরুণের জন্য। আমার এ অভিশপ্ত জীবনের জন্য আমিই দায়ী। ইচ্ছে হ'য়েছে বার বার অরুণের কাছে গিয়ে বলি, তুমি আমাকে গ্রহণ করো। এবার আমি উজাড় করে তোমাকে দিতে এসেছি আমার যা কিছু আছে। ইচ্ছে হ'য়েছে গিয়ে বলি, অরুণ, ভালবাসা হ'চ্ছে শাপগ্রস্ত জীবন বহন করার ছাড়পত্র। তাইতো তোমার জন্য এত দুঃখ পাচ্ছি। তোমাকে আমি আঘাত করেছি বলে আজ আমি এত অসুখী। জানো অরুণ, আমার সব আছে —অথচ কিছুই নেই। আমি আজ সব কিছু থেকে বঞ্চিতা। স্বামী আমাকে নিয়ে সুখী নন বলে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করেছেন। যে দিন তিনি প্রথম এলেন বিয়ে করে, সে দিন

আমার খুব জ্বর। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করছি। নতুন বৌ-কে নিয়েই আমার ঘরে এলেন। নতুন বৌকে তিনি বললেন ঃ তোমার দিদি হয়। প্রণাম করো। বৌটির সলজ্জ চাহনি। সহরে বোধ হয় এই প্রথম এলো। আমাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে তাকে আশীর্ব্বাদ করার কোন ভাষা খুঁজে পাইনি। তবু তাকে অন্তর দিয়ে বলেছিলাম ঃ সুখী হও। তাকে যখন আশীর্ব্বাদ করি তখন আমি মেয়েছেলের মন নিয়ে দেখেছিলাম। কিন্তু আমার স্বামীকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি। প্রতিহিংসা নেবার একটা অদম্য স্পৃহা আমার মধ্যে গুমরে উঠেছিল। আমি আমার স্বামীকে ঠিক ভালবাসতে পারি নি। ভালবাসতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অরুণই ছিল আমার মন জুড়ে। তাই সে জন্য আমার হিংসা হয়নি। দুঃখ হ'য়েছিল খুব। এত দুঃখ হয়েছিল যে, নিজেকে সামলাতে না পেরে আমার শরীর খুব দুর্বল হ'য়ে পড়ল। শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়লাম। হ্যাঁ, দুঃখ হ'য়েছিল—এই ভেবে যে, অরুণ জানতে পারলে মনে মনে বেশ একটু হাসবে। হয়তো বা 'বেচারী' বলে সমবেদনা প্রকাশ করবে। এইটেই ছিল আমার সব চেয়ে অসহ্য! কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমার সে লজ্জা ক্ষোভ সব কিছুই কেটে গেল। আমার শয্যার পাশে বসে আমার স্বামী ও নতুন বৌ খুব সেবা শুশ্রূষা করেন। তাদের সেবা ও যত্নে সে যাত্রা আমি রক্ষা পাই।"

নবারুণ খাতাটা মুড়ে রেখে চিন্তা করে মনীষার কথা। মনে মনে ভাবে, মনীষা যদি এতই অসুখী—তবে সে তার কাছে তা প্রকাশ করতে লজ্জা পায় কেন। মানুষের জীবনে সুখ শান্তি আসার নিশ্চয়তা কোথায়? যদি সুখ শান্তি নাই থাকে—তবে তা নবারুণের কাছে গোপন করার কি কারণ থাকতে পারে?

দূরে জানলা দিয়ে সীতা একমনে তাকিয়েছিল। নবারুণের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে একটু স্মিত হাসে। নবারুণও খাতাটা মুড়ে রাখে। সীতা ও প্রদীপ এসে ঢোকে ঘরে।

প্রদীপ বলে: চলুন, আজ আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাই।

—কোথায় যাবে?

—কেন স্টেশনের দিকে?

—স্টেশনে কেন?

সীতা বলে: ওদের বাবা ফিরছেন না বলে ওরা বেশ অস্থির হ'য়ে উঠেচে।

নবারুণ প্রদীপের হাতটি নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলে: ভয় কি? বাবা তোমার ঠিকই আসবেন। তোমার বাবার জন্যই তো অপেক্ষা করছি। দেখা না করে যেতে মন চায় না।

প্রদীপ বললে: আমার বাবার জন্য মন কেমন করছে। ভাল মারও মন খারাপ।

সীতা ছেলেকে ধমক দিয়ে বলে ওঠে: বোকার মত কথা বোল না প্রদীপ।

প্রদীপ অত কিছু বোঝে না। তাই সীতার মুখের উপর বলে: বারে—এইতো তুমি মন্দিরের কাছে বেড়াতে গিয়ে বললে, তোমারও মন কেমন করছে।

সীতা কোন কথা না বলেই ঘর থেকে চলে যায়। বোধ হয় সে লজ্জা পেয়েছে। স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রীর মন খারাপ হবার যথেষ্ট কারণ থাকে। সীতারও যে মন খারাপ হবে—তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে! কিন্তু এইভাবে সব কথা জানাজানি হ'য়ে যাওয়ায় সীতা যেন একটু বেশী লজ্জিত হ'য়ে পড়ে।

সীতার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপও ছুট্ মারে ভিতরের দিকে।

নবারুণ আবার পড়তে সুরু করে:

"আজ একা একা সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার স্বামী গেছলেন তাঁর নতুন বৌকে নিয়ে স্টেশনের দিকে বেড়াতে। চাঁদের আলোয় সমুদ্রের পাড়ে কত লোক এসে বসে আছে। ঢেউ-এর পর ঢেউ আসছে—আমি শুধু তা লক্ষ্য করে চলেছি। রূপকথার স্বপ্নরাজ্যের বর্ণনার সঙ্গে আজকের এই প্রথম রাত্রিটা হুবহু মিলে যায়। রাজকন্যা একা—সম্পূর্ণ একা। তার কোনো সঙ্গী নেই আজ। রাজপুত্র চলে গেছে পক্ষীরাজ ঘোড়া করে। রাজকন্যা সেই পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে রাজপুত্রের জন্য। কিন্তু কোথায় রাজপুত্র? রাজকন্যাকে ফাঁকি দিয়ে সে বিয়ে করেছে এক সওদাগরের মেয়েকে। তার রূপ আছে, ঐশ্বর্য আছে।

ভোগের মধ্যে থেকে রাজপুত্রের লোভ গেছে বেড়ে। এখন সে শুধু চায় ঐশ্বর্য। শুধু চিন্তা, কী করে মণি মুক্তা সঞ্চয় করবে। কী করে সওদাগর কন্যাকে আরো সুখী করবে। সওদাগরের কন্যার রূপ আছে—কিন্তু কোনো গুণ নেই। তবু রাজপুত্র সেই সওদাগরের কন্যার রূপে বিমোহিত হয়ে তার বাল্য সাথী রাজকন্যার কথা একেবারে ভুলে গেল। এদিকে রাজ-কন্যা গুমরে গুমরে কাঁদে—রাজপুত্র আর কোনদিন আসে না। রাজকন্যার সব কথা একেবারে ভুলে যায়।"

নবারুণ খাতাটা বন্ধ করে ফেলে। রাত্রি হ'য়েছে। সারাদিন ধরে মনীষার লেখা সে পড়েছে। এখনও অনেক পাতা বাকি আছে। বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে শুয়ে সে ভাবে মনীষার কথা। অমিয়কে বিয়ে করে মনীষা সুখী হয়নি। তাই তার লেখায় সেই ক্ষোভ। অমিয় কিন্তু মনীষাকে ভালবাসে। কিন্তু সে যে শিল্পী। সাধারণ মানুষের মত তার বিবেচনাশক্তি মোটেই নেই। শিশুর মত সে সরল। এদের দু'জনের মধ্যে কোথায় যেন একটা গরমিল রয়ে গেছে। মনীষা ও অমিয় তা জানলেও কেউ কারুর কাছে সে কথা প্রকাশ করে না। আশ্চর্য হ'য়ে যায় নবারুণ মনীষার লেখা প'ড়ে। এই ক'দিনে একটি বারের জন্যও মনীষা নবারুণকে তার মনের গোপন ব্যথা প্রকাশ করেনি।

অনেক রাত্রি অবধি এদের কথা ভাবতে ভাবতে নবারুণ ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে আসছে—এমন সময় মনীষা লক্ষ্য করে নবারুণের ঘরে আলো জ্বলছে। মনীষার ঘর থেকে নবারুণের ঘর সোজাসুজি দেখা যায় না। নবারুণের ঘর থেকে বাইরের দেয়ালে আলো এসে পড়েছে।

মনীষার ইচ্ছে হয় নবারুণকে একবার দেখে। ঘুমন্ত নবারুণকে দেখার লোভ হয়। খুব সন্তর্পণে এসে সে দাঁড়ায় ঘরের সামনে। বিমোহিত হয়ে মনীষা তাকিয়ে থাকে নবারুণের দিকে। ঘুমোলে মানুষকে এত সুন্দর দেখায়! নবারুণ যে সুপুরুষ, মনীষা তা এই মুহূর্তে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে।

স্থির, শান্ত, সৌম্য মূর্তি নবারুণের। ঘুমের ঘোরে সে একবার পাশ ফেরে। মনীষা ধীরে ধীরে একেবারে তার বিছানায় কাছে এসে দাঁড়ায়।

মনীষার ইচ্ছে হয় নবারুণকে ডাকে, কিন্তু কেন জানি না তার ভয় হয়। যদি নবারুণ কিছু মনে করে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে নিশ্চয় তার মনের পরিবর্তন হ'য়েছে।

ইচ্ছে হয় স্পর্শ করতে।···মনীষা নবারুণের হাতটি তুলে নেয় তার হাতে। হাতের মধ্যে সাড়া পাওয়া যায়। স্পষ্ট অনুভব করে জীবনের স্পন্দন। নবারুণের দেহের উত্তাপ মনীষার মনকে যেন আরো সজীব করে তোলে। ইচ্ছে ক'রে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে: আমি মনীষা। তোমার সেই রাজকন্যা এসেছে আজ তোমার কাছে। রাজপুত্রের ঘুম কি ভাঙ্গবে না? চোখ চেয়ে দেখ রাজপুত্র, আমি এসেছি। রূপকথার কাহিনী আজ

বাস্তবে রূপায়িত হ'য়েছে। আজ আর মেঘের আড়াল থেকে লুকোচুরি খেলা নয়। সে একেবারে নবারুণের কাছে।···নিজের গাল দিয়ে সে অনুভব করে নবারুণের নিশ্বাস। মনীষার স্পর্শে নবারুণ চোখ চায়। তার মনে হয় মনীষা যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন মায়া। তার সেই নিদ্রাকাতর চাহনি বিশেষ করে আকর্ষণ করে মনীষাকে।

নবারুণের সে চাহনিতে দেখা যায়—রাত্রির কুহেলিকা, অরণ্যের গভীর রহস্য।

মনীষার হাতের মধ্যে তখনও নবারুণের হাতটি রয়েছে।

মনীষার আগমনে নবারুণ এতটুকু বিস্মিত হয় না। শুধু অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মনীষার দিকে। মনীষা আলোটা নিভিয়ে দিয়ে নবারুণের খুব কাছ ঘেঁষে এসে বসে।

···অনেক পরে নবারুণ জিগেস করেঃ এত রাত্রে—এমনি ভাবে কেন এলে মনীষা?

—দিনের আলোয় আসার কোন সুযোগ নেই ব'লে! মনীষা নবারুণের চুলের মধ্যে তার আঙ্গুলগুলো ঢুকিয়ে দেয়। জানালা দিয়ে ওপাশের একটা হোটেলের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। মনীষা স্পষ্ট দেখতে পায়—নবারুণের চোখগুলো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

—কিন্তু যদি কেউ দেখে?

—সে লজ্জা আমার।

মনীষার কণ্ঠস্বর খুব ভারী শোনায়। সে যেন সকল কিছুকে

উপেক্ষা করার জন্য প্রস্তুত। জীবনের এই পরম মুহূর্তটিকে সে আর কিছুতেই হারাতে প্রস্তুত নয়।

নবারুণ বলে : আবার তুমি দুঃখ দেবে। এর জন্য তুমিও কম কষ্ট পাবে না? আমার মনে হয়—তোমার আর ভুল করা উচিত হবে না।

মনীষা বললে : যে দিন তোমাকে আমি প্রথম দেখি সে দিনই ভুল করে ফেলেছি। সে দিনই জানি—দুঃখ আমি পাবো, যে কোনো কারণেই হোক আমাদের মিলন সম্ভব হোল না। অথচ তুমি ও আমি দু'জনেই চেয়েছিলাম সুখের একটা নীড় বাঁধতে। আমাদের সে স্বপ্ন সার্থক হয়নি। এর জন্য অবশ্য কিছুটা আমিই দায়ী। তোমার ওপর অভিমান করে আমি বিয়ে করেছিলুম! আজও তার প্রায়শ্চিত্ত করছি।

নবারুণ বললে : ভালবেসে কেউ কোন দিন সুখী হয় না।

—তবু শোন, আজ এই মুহূর্তে আমি এসেছি তোমাকে কয়েকটি কথা বলতে। যদি অভয় দাও তো বলি।

—বলো। তোমার কোনো কথাই তো আমি না করতে পারি না। এটা আমার দুর্বলতা বলতেও পার।

—নবারুণ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি জানি তুমি আমার জন্য একটা অস্বস্তি ভোগ করছো। পাপ, পুণ্য আমি জানিনে—তবে আমি যে তোমার দুঃখের কারণ, তা আমি জানি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো—তবে জীবনভোর আমি শান্তি পাবো না। পরকালের কথা না হয় এখানে নাই বললাম।

নবারুণ কোনো জবাব দেয় না। বাইরের জানলা দিয়ে তার মুখে আলো এসে পড়েছে। মনীষা স্পষ্ট দেখে তার চোখ জলে ভরে গেছে।

—এ কি নবারুণ—তুমি কাঁদছো? নবারুণ তবু নিরুত্তর।

মনীষা নবারুণের বুকের ওপর তার গালটা রেখে, ধীরে ধীরে হাত দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলে: আমিও অনেক শাস্তি পেয়েছি। এবার তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো—তবে আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না।

নবারুণের মুখের কাছে নিজের মুখটা নিয়ে মনীষা বলে: আজ তুমি পারো না আমাকে গ্রহণ করতে? একদিন তুমি আমাকে তোমার এই বুকে স্থান দিয়েছিলে। আজ আমি জোর করে তার দাবী জানাচ্ছি, মিনতি করছি—তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।

নবারুণ কিছু বলার আগেই, মনীষা নিজের মুখটা এগিয়ে নিয়ে যায় নবারুণের কাছে। গভীর আবেগে তার মুখে একটি চুম্বন এঁকে দেয়। সে চুম্বন অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। যতক্ষণ না প্রশ্বাস ছাড়ার অসুবিধা হ'চ্ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। মনীষা স্পষ্ট অনুভব করে নবারুণের দেহের উত্তাপ। নবারুণের গাল বেয়ে এসে পড়েছে তার চোখের জলের দীর্ঘ রেখা। মনীষা এবার তার আঁচলের খুঁট দিয়ে তা মুছিয়ে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে নবারুণকে আরো বুকের কাছে এনে চেপে ধরে।···মনীষার উত্তপ্ত নিশ্বাস নবারুণ অনুভব করে।

ঠিক এমনি ক'রে বহুদিন নবারুণ মনীষাকে পেয়েছে একান্তভাবে —অতি নির্জনে। সেদিন পরস্পরের কোনো ভাষা ছিল না। মিলনই যেন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সে দিন নবারুণ দেখেছে তার আত্মনির্ভরতা। মিলনে সে কী তৃপ্তি! জীবনের প্রশ্ন ছিল সম্পূর্ণ উহ্য। সেদিনের মনীষার সঙ্গে আজকের মনীষার কোনো প্রভেদ নেই। সেই উন্মাদনা। কোনো ভাষা নেই। মনীষা এসেছে নবারুণের কাছে। আজ সে চায় পরম মুক্তি। মনীষাকে নবারুণের খুব ভাল লাগে। এত ভাল তার কোনোদিন লাগেনি। মনের আবর্তে তারা পরস্পর পরস্পরকে হারিয়ে ফেলে। কিছুক্ষণ পরে এদের সংলাপ হ'য়ে যায় স্তব্ধ।

দেহের প্রতিটি শিরায় আসে উচ্ছ্বাস।

পরস্পরে অনুভব করে—তাদের মনে এসেছে আদিম উচ্ছ্বাস। তারপর—তৃপ্তি। নিস্তব্ধ, নিশুতি রাত্রে বহু সঞ্চিত বেদনার হয় উপশম। জীবনের ছন্দের হয় বিকাশ।

সেই আদিম প্রশ্ন। জ্ঞান বৃক্ষের ফল ও শয়তানের আবির্ভাব। মনীষার মধ্যে নবারুণ খুঁজে পায় মহাশ্বেতাকে। ইন্দ্রানী যেন উর্ব্বশীর নৃত্যে দিশেহারা। কামাখ্যা-মেয়ে দেবযানী, ছোঁয়াচ পাওয়া যায় উষা-সঙ্গিনী প্রিয়ংবদা আর পত্রলেখার। মনীষার ছায়ায় দেখা যায়, কচ্ছ কন্যা দিদ্দা আর আর্টেমিস। মোনালিসা ও অর্জুনের মণিমালা। আর সেই মণিপুরী চিত্রাঙ্গদা। আর বসন্তসেনার পদধ্বনি, হেলেনের ছোঁয়াচে নবারুণের হৃদয় যেন পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়। মনীষার চোখে কার্থেজের

ডিডোর অভিমান ভরা চোখের ছায়া। নারীত্বের প্রতিবিম্ব মূর্ত হ'য়ে ওঠে। জীবনের প্রশ্ন যদি অব্যক্ত থাকে—তবে দ্রৌপদীর অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-কে ব্যাসদেব আর যাই কিছু বোঝাতে চেষ্টা করে থাকুন না কেন, দ্রৌপদী সতী আর মহাভারত তাই এপিক বলে স্বীকৃত।

সেই রাত্রি স্মরণীয় হ'য়ে থাকে নবারুণ ও মনীষার জীবনে। তার কারণ ভোর রাত্রি পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরকে নতুন করে জানার সুযোগ পেয়েছিল।

॥ দশ ॥

খুব ভোরে উঠে সীতা গেছে বেড়াতে। সঙ্গে আছে শিখা। বেড়াতে বেড়াতে তারা গিয়ে বসে সমুদ্রের ধারে। দেবদারু গাছের ঝালরের আড়াল থেকে দেখা যায় ভোরের আকাশ। সমুদ্রের সঙ্গে মিলে গেছে। কয়েকদিন ধরে সীতার মনটা খুব খারাপ। অমিয় যে সেই গেছে—তারপর আর তার কোনো খবর নেই। সীতার ভাবনা হয়, কিন্তু প্রকাশ করে না কিছু। মনীষার মন খারাপ হয়েছে কী না—তা বোঝা যায় না। তবে সীতার মুখ চোখ দেখলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বোঝা যায় তার মনে বেগে ঝড় বইছে।

শিখাকে নিয়ে সীতা বসে বসে সমুদ্রের ঢেউ দেখছে। ক্রমেই লোকের আগমনে ভীড় বাড়তে থাকে। পুরীতে আর কি আনন্দ আছে? ভোর বেলায় সমুদ্রের ধারে বেড়ানই তো একমাত্র আনন্দ।

নবারুণও বেরিয়েছে একা একা। ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পড়ে সীতার সামনে।

—আপনি! সীতার মুখে সেই হাসি। নবারুণের এই সময় একা একা আসাটা যেন তার কাছে কল্পনাতীত মনে হয়।

সীতা আরো বলেঃ আসবেন জানলে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আসতুম।

—খেয়াল হলো বেড়াতে বেরোই। তাই ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি। ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন, তাই দেখা হয়ে গেল আপনার সঙ্গে।

সীতা নিরুত্তর। এর জবাব দেবার কিছু নেই। যদি বা কিছু দেওয়া যায়—তা অনর্থক সংলাপ বাড়োনো ছাড়া কিছু নয়।

নবারুণ সীতার পাশে বসে পড়ে। শিখার মাথায় হাত বুলতে বুলতে সে বলেঃ ও দুষ্টু মেয়ে—আমাকে বেড়াতে নিয়ে আসবে বলে একাই চলে এসেছো। শিখা খিল খিল করে হেসে সীতার কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলে। নবারুণের বলার ভঙ্গিটা দেখে শিখার হাসি পায়। কথা বলার আর তার কি আছে? হেসেই সে কুটকুটি হয়ে পড়ে।

নবারুণ প্রথমে কথা সুরু করেঃ অমিয়র কোনো চিঠি

পেয়েছেন ?

—না।

—কী অদ্ভুত বলুন তো, আমাকে আসার জন্য বলে নিজে একেবারে নিরুদ্দেশ ?

—নিরুদ্দেশ কেন হবেন, গোয়ালিয়র গেছেন। আমাদের তো ঠিকানা জানা আছে।

—চিঠি দিয়েছেন না কি আপনি ?

সীতা যেন কী বলতে গিয়ে থেমে যায়।

কিছুক্ষণ পরে বলে : চিঠি দিয়ে লাভ কী যদি না জবাব আসে। সীতার যে অভিমান হয়েছে—তা স্পষ্ট বোঝা যায় তার কথায়।

নবারুণ বলে : অমিয়র জন্য আপনার ভাবনা হওয়া খুব স্বাভাবিক। মনীষাকে দেখলে কিন্তু বোঝা যায় না—তার ভাবনা আছে।

সীতা বলে : ভাবনা আছে, কিন্তু তাকে দেখলে অবশ্য কিছুই বোঝা যায় না।

সীতা একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে।

নবারুণ বললে : চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি ওদিক থেকে।

সীতা সম্মতি জানিয়ে বলে : চলুন।

উঠে পড়ে দু'জনে। শিখা দাঁড়িয়ে একটা বাচ্ছা শিশুকে লক্ষ্য করছিল। এদের উঠতে দেখে ছুটে আসে। তারপর সুরু হয় এদের যাত্রা।

সমুদ্রের পাড় ধরে অনেক দূর পর্যন্ত—কথা বলতে বলতে সীতা, নবারুণ ও শিখা চলে।

ফেরবার সময় সীতা বললে: দেরী হয়ে গেল। বাড়ীতে ওরা না জানি কী ভাবছে।

—ভাবার আর কি আছে?

—আছে বৈ কী। সীতা বলে: এত যত্ন, এত স্নেহ আমার নিজের বোন থাকলেও করতো না।

নবারুণ বলে: কার কথা বলছেন?

—আমার দিদির কথা।

নবারুণ বলে: আপনার দিদি মানে—মনীষা।

—হ্যাঁ। ছোট্ট উত্তর দেয় সীতা।

শিখা একটু এগিয়ে এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে সীতা ডেকে তাকে সাবধান করে দেয়।

হঠাৎ নবারুণ বলে: অগ্নিকে দেখলে আমার হিংসে হয়।

—কেন বলুনতো?

—তার সুখ, তার জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য। মনীষা ও আপনার মত সঙ্গিনী। এ সবই তো দেখলে হিংসে হওয়া স্বাভাবিক।

সীতা একবার তাকায় নবারুণের দিকে। তার চোখে সে কী বিস্ময়ের চাহনি! তার মনের ছবি ভেসে ওঠে চোখে। মেঘলা দিনের বাতাসের মত স্নিগ্ধ, রাত্রির আকাশের নক্ষত্রের মত জীবন্ত।

সীতা বললে: কিন্তু, তিনি বোধ হয় আমাদের নিয়ে সুখী নন।

—কেন ?

—এটা পুরুষদের স্বভাব। মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস। সাধারণতঃ দেখবেন—মানুষ যা পায় তা সে চায় না। আবার যা চায়—তা সে পায় না।

—গোটা পুরুষ জাতকে শত্রু করে লাভ কি ? পরে যে আক্ষেপ করতে হবে।

—আক্ষেপ আমি করি না। হয়তো ভবিষ্যতে অতীতের কথা মনে করে আক্ষেপ করতে হবে। তবু জানবেন, মেয়েরা যতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারে পুরুষেরা তা পারে না।

—আপনি যদি অমিয়কে দিয়ে গোটা পুরুষ জাতকে বিচার করেন—তা হ'লে ভুল করবেন। সমাজে শিল্পীদের একটা উচ্চাসন দেওয়া হ'য়ে থাকে। এর প্রধান কারণ শিল্পীরা শিল্প সৃষ্টির কাজে থাকে ব্যস্ত। বাস্তব জীবনের অনেক কিছুর বিষয়ে খেয়াল করে না। সব সময় মনে রাখবেন, শিল্পীকে ভালবাসা যায়। কিন্তু, তার কাছ থেকে ভালবাসা পাবার আশা করলেই ভুল করবেন।

সীতা বললে : আমি ভালবাসা না পেলেও কিছু মনে করিনে। ভালবাসা না পাই—তাতে কিছু এসে যায় না, তবে অবজ্ঞা কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে।

কথা বলতে বলতে নবারুণ ও সীতা যে কখন পথে এসে পড়েছে খেয়াল নেই। কয়েকদিন হলো যাত্রীর সংখ্যা একটু বেড়েছে। বেলা বাড়লে পথে বেড়ানোর আর উপায় নেই।

নবারুণ বলে : আপনার নামের সঙ্গে আপনার কোনো মিল নেই।

সীতা বলে : বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা থাকে না। নামকরণ করার অধিকার যাঁদের থাকে—ভবিষ্যতের ঝুঁকি কোন দিনই তাঁরা নেন না। তাই ব্যবহারিক জীবনে প্রায়ই দেখা যায় এর ফলটা হয়েছে উল্টো। অনেকটা জ্যামিতিক সম্পাতের মত। বিন্দু থেকে উৎপত্তি, আবার বিন্দুতেই তার নিষ্পত্তি।

—সীতাকে রামচন্দ্রের পাশাপাশি আমরা দেখে এসেছি। পৃথকভাবে দেখার সুযোগ পাইনি। যেখানে দেখেছি একটু পৃথক করে—সেখানেই জানতে পেরেছি মাতৃরূপী সীতা। আসলে সীতা হ'চ্ছে প্রকৃতির অপর রূপ। রামচন্দ্র পুরুষ। এই পুরুষ ও প্রকৃতির এক একটি অনুচ্ছেদকে নিয়ে রচিত হয়েছে মহাকাব্য।

সীতা এ সব ঠিকমত বুঝতে পারে না। কী যেন ভেবে সে মনে মনে হাসে। তারপর নবারুণের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে প্রশ্ন করে : কি নাম হ'লে আপনার মনে হয় ঠিক হ'তো?

—আর যাই হোক, সীতা নয়।

—তবু একটা বলুন না।

—ধরুন উর্মিলা বা চিত্রলেখা।

কি এক বিস্ময়ের চাহনি সীতার চোখে। আর কোনো কথা বলতে যেন মন চায় না তার। শিখার হাত ধরে এগিয়ে আসে বাড়ীর দিকে।

এবার নবারুণ বললে : একটা কথা বলবেন ?

—কি কথা ?

—মনীষাকে আপনার হিংসে হয় না ?

—না। তার কারণ আমিই বরং তাকে আঘাত করেছি। আমাকে তিনি কোনদিন কোন মুহূর্তের জন্যও আঘাত করেননি।

এরপর নবারুণ ও সীতার মধ্যে আর কোন কথা হয়নি। শুধু বাড়ীতে পৌঁছনোর আগে সীতা বলেছিল : আপনার সঙ্গ পেয়ে আজকের সকালটা আমার খুব ভাল লাগল। আর কোন দিন ঠিক এমনি করে আপনাকে পাবো কিনা জানি না। যদি নাও পাই—তবে দুঃখ নেই। যতটুকু আনন্দ আজ পেলাম—তা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই ভাল লাগাকে কী বলে জানি না, তবে পূজার সময় ধূপ জ্বালালে তার গন্ধে যেমন মন ভরে যায়—আজও আমার মন অনেকটা সেই রকম ভাবে ভরে উঠেছে। আপনাকে ঠিক হয়ত বোঝাতে পারলুম না।

নবারুণ আর সীতাকে একসঙ্গে দেখে মনীষা বেশ যেন অবাক হ'য়ে গেল। সে বললে : তোমরা কি একসঙ্গে বেরিয়েছিলে ?

প্রশ্নটা দুজনকে লক্ষ্য করেই করেছিল মনীষা। নবারুণই তার উত্তর দিল। সে বললে : খুব ভোরে উঠে আমি একাই বেরিয়েছিলাম, ওঁর সঙ্গে সমুদ্রের ধারে দেখা হয়ে গেল।

মনীষা বললে : এরই মধ্যে বেড়ানো হ'য়ে গেল নবারুণ ?

সীতা বললে : দিদি, তুমি যদি যেতে তবে আমরা স্বর্গদ্বারে যেতাম। ওখানে গেলে মনটা ভাল হ'য়ে যায়।

মনীষা আর কোন কথা বলেনি।

এমন সময় পিয়োন এলো টেলিগ্রাম নিয়ে।

মনীষা সই করে নিল। টেলিগ্রাম এসেছে গোয়ালিয়র থেকে। অমিয় আজ বেলা দুটোয় এসে পৌঁছবে।

এ খবর শুনে সীতার মুখের শুকনো ভাবটা কেটে গিয়ে হাসি বেরোলো। সে কোনো কথা না বলেই সেখান থেকে চলে গেল।

মনীষা বললে : ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে যাবো স্বর্গদ্বারে। স্বর্গদ্বার থেকে বঙ্গোপসাগর ভাল দেখায়। জেলে ডিঙি দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে যেতুম দরিয়া মহাবীরের মন্দির।

নবারুণ বললে : চলো না যাই। শুনেছি মহাবীরের মন্দিরের কাছে বেড়াবার জায়গা আছে। তোমার সঙ্গে বেড়াবার লোভেই তো এতদূরে এলাম।

—আজ আর যাওয়া হবে না। উনি আসছেন। এসে যদি আমাদের না দেখতে পান—তবে নিশ্চয় খুব দুঃখিত হবেন। আমাদের এ বাড়ীর নিয়ম কি জানো নবারুণ ? উনি বাইরে থেকে বাড়ীতে না এলে আমরা কোথাও যাই না। সংসারের শান্তি ঐখানে।

—অচিরাকে আমি কিন্তু এর জন্য কোন অভিযোগই করি না।

তার অবশ্য কোন দোষ নেই। অফিস থেকে কাজ সেরে বাড়ী ফিরতে আমার খুব দেরী হয়। আমার জন্য অপেক্ষা করলে তার আর বেড়াতে যাওয়া হয় না।

—আমি বুঝি ঘরের শান্তি। ঘরের শান্তি না থাকলে মনের শান্তি থাকবে কোথা থেকে?

দুপুরের খাওয়া সেরে যখন সব কাজ চুকে গেল তখন সীতা মনীষাকে ডেকে বললে, দিদি আমি স্টেশনে যেতে চাই। তুমি যদি অনুমতি দাও তো যেতে পারি।

মনীষা বললে: চলো না—আমরা সকলে মিলে স্টেশনে যাই। নবারুণ, যাবে আমাদের সঙ্গে?

—মন্দ কি? বললে নবারুণ, সকলে মিলে অপেক্ষা করলে অমিয় অবাক হ'য়ে যাবে।

স্থির হলো সকলে গিয়ে অপেক্ষা করবে। বাড়ী থেকে একটু আগেই বেরুলো সকলে। শিখা ও প্রদীপকে প্রথমে বৃন্দাবনের কাছে রেখে যাওয়ার কথা হ'য়েছিল, কিন্তু যাবার সময় সে মত বদলে গেল। শিখা ও প্রদীপকে নিয়েই শেষে সকলে মিলে রওনা হলো স্টেশনে। তিনটের সময় ট্রেন এসে পৌঁছবে। কে প্রথমে অমিয়র সঙ্গে কথা বলবে—তারও মোটামুটি সব ঠিক হয়ে গেল। প্রদীপ ও শিখার আনন্দ আর ধরে না। অনেক দিন হয়ে গেছে বাবাকে তারা কাছে পায়নি। আজ তাদের বাবা ফিরবেন শুনে তারাও খুব খুশি।

ট্রেন একটু লেট আছে। খবর নিয়ে এলো নবারুণ স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে।

ক্রমে ট্রেনের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। সকলেই উদ্বিগ্ন হ'য়ে অপেক্ষা করছে। শিখা ও প্রদীপের ধৈর্যচ্যুতি হ'য়েছে। কেন তাদের বাবা এখনও আসছেন না—এর জবাবদিহি তারা চায় তাদের মার কাছ থেকে। মনীষার আর যাই হোক ছেলেদের শাসন করার পদ্ধতি ভারী সুন্দর। একে তাদের সকলেই নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন না আসার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে, তার ওপর ছেলেদের এই ধরনের কথায় মনীষার বেশ রাগ হয়।

মনীষা ধমক দিয়ে বলে: অসভ্যতা কোর না প্রদীপ। দেখছো না আমরাও সকলে অপেক্ষা করছি।

প্রদীপ আর কোনো কথা বলে না।

সীতা প্ল্যাটফর্মের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঘুরে আসে। স্টেশনের অন্যান্য যাত্রীরা অপেক্ষা করছে যাবার জন্য। রোদটা আজ বেশ একটু চড়া।

সীতার যেন আর সহ্য হয় না। সে মনীষাকে বললে: দিদি—এ অপেক্ষার কি শেষ নেই?

—ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন সীতা? ট্রেন যদি একটু লেট থাকে—তাতে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠার কী থাকতে পারে?

সীতা চুপ করে যায়। নবারুণ সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে

ফেলে দেয়। একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মনীষার খুব কাছে এসে বললে ঃ অমিয়র ভাগ্য দেখলে ঈর্ষা হয়। তোমরা সকলেই তাকে ভালবাস। মনীষা নবারুণের মুখের দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে হাসল যে তার অর্থ হয়—'তুমি কিছু বোঝ না।' মনীষা বললে তাই ঃ নবারুণ, তোমাকে আমি অনেক দিন থেকে দেখছি, তোমার সেই ছেলেমানুষী ভাবটা আজও আছে। সব কিছু তুমি এখনও বুঝতে পার না। কর্তব্য পালন করা মানেই ভালবাসা নয়।

প্রদীপ হঠাৎ চীৎকার করে বলে ওঠে ঃ ঐ আসছে। ভালমা ঐ ট্রেন আসছে। সীতা মুখ বাড়িয়ে পায়ের আঙ্গুলগুলোর ওপর ভর করে উঁচু হ'য়ে দেখে সত্যি ট্রেন আসছে। বিরাট দৈত্যের মত ইঞ্জিনটা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে। চারিদিক ধোঁয়ায় অন্ধকারময় হ'য়ে গেছে। ক্রমেই সকলকে সতর্ক করিয়ে দিতে দিতে আসছে যাত্রীবাহী ট্রেনটা।

সীতার উদ্বেগের বোধ হয় শেষ হলো। স্বস্তির প্রচ্ছন্ন একটা ভাব তার মুখে স্পষ্ট দেখা যায়। ইঞ্জিনটা প্লাটফর্মের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। স্টীম পাইপ থেকে এক ঝাঁক্ স্টীম ছেড়ে বার করে দিয়ে ইঞ্জিনটা ঝিমিয়ে পড়ে।

এদিকে যাত্রীদের কোলাহল। মনীষা প্রদীপ ও শিখার হাত ধরে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। নবারুণ ও সীতা যাত্রীদের লক্ষ্য করতে থাকে। এই ভীড়ের মধ্যে থেকেই অমিয়কে খুঁজে বার করতে হবে।

সকলেই উদগ্রীব হ'য়ে লক্ষ্য করে যাত্রীদের। ভীড়ের মধ্যে

থেকে অমিয়র মুখটি দেখবার পর, এদের আর আনন্দের সীমা থাকবে না।

একে একে সকলেই চলে যায়। ক্রমে ক্রমে স্তব্ধ হয়ে আসে মানুষের কোলাহল। এই ট্রেনে কিন্তু অমিয় আসেনি। অমিয়কে দেখতে না পাওয়ায় সকলেই বেশ মুষড়ে পড়ে। নবারুণই প্রথমে সুরু করে: এ গাড়ীতে অমিয় আসেনি। ছোট ছেলে মেয়ে দুটো একই সঙ্গে প্রশ্ন করে মনীষাকে: কৈ মা—বাবা এলো না কেন?

মনীষা এর কী জবাব দেবে তা ভেবে পায় না! তবু তাদের মনে যাতে কোনো রকম আঘাত না লাগে, সে জন্য বললে: পরের গাড়ীতে আসবেন। ভাবনা করার কী আছে?

মনীষার এ জবাব সকলেরই কানে গিয়ে পৌঁছয়। এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করার এই ফল জানলে সীতা কেন কেউই হয়তো স্টেশনে আসতো না।

নবারুণ বললে: চলো মনীষা, ফেরা যাক। আর অপেক্ষা করে কোনও লাভ নেই।

মনীষা খুব সংক্ষেপে বলে: চলো।

অমিয় সে দিন তো ফেরেনি—এর প্রায় তিন দিন পরে ফিরেছিল। টেলিগ্রাম পাওয়ার পর থেকে সকলেই বিশেষ ভাবে চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিল অমিয়র জন্য। অমিয় ফিরে আসায় চিন্তার অবসান ঘটলেও মনের অবস্থা কারুরই ভাল ছিল না। বিশেষ করে—সীতার।

সীতা ও মনীষা কেউই কোনো অভিযোগ জানায়নি অমিয়কে। অভিযোগ করে ফল কি? যাকে অভিযোগ জানাবে —সে যদি অভিযোগ না শোনে বা তার কোনো উপযুক্ত উত্তর দিতে অক্ষম হয়, তবে তা জানিয়ে লাভ কি?

অমিয় কিন্তু একা আসেনি। সঙ্গে করে এনেছে একটি মেয়ে, নাম তার দেবীকা।

নবারুণকে দেখে অমিয়র খুশি আর ধরে না। তাকে জড়িয়ে ধরে সে বলেছিল: তুমি আসবে জানলে আমি কিছুতেই বাইরে যেতুম না। যাক্, তোমাকে পেয়ে ক'দিন বেশ গল্প করে কাটবে।

॥ এগারো ॥

অমিয়র আসার পর থেকেই সব সময় এ বাড়ীর চারদিকে যেন একটা থমথমে ভাব দেখা যায়। হাসি বা আনন্দ নেই বললেই হয়। দেবীকা আসার জন্য বোধ হয়—এদের মনোভাবের পরিবর্তন হ'য়েছে। মনীষা বা সীতা এজন্য অমিয়কে একটি কথাও বলেনি। দেবীকার সঠিক পরিচয় কেউই ভাল করে জানে না। শুধু—যেদিন অমিয় ফেরে সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে বসে অমিয় নবারুণকে লক্ষ্য করে বলেছিল: দেবীকা নৃত্যশিল্পী। দেবদাসীদের মত গোয়ালিয়রের কোনো এক কণৌজ ব্রাহ্মণের

পালিত কন্যা। ব্রাহ্মণ মহা পণ্ডিত। সারাদিন মন্দিরে থাকেন। দেবার্চনা এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠ ছাড়া আর কিছুই করেন না। মন্দিরের আয় যথেষ্ট। বহু দূর দেশ থেকে সব যাত্রীরা আসে পূজো দিতে। মন্দিরের বিগ্রহ হ'চ্ছে কমলাক্ষী মূর্তি। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা এটাকে শান্তি দুর্গার মন্দির বলে থাকে।

প্রবাদ আছে, থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের জন্য যখন চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তখন কণৌজ রাজ্য ছিল শশাঙ্কের হাতে। মালাবারের রাজা দেবগুপ্ত রাজ্যশ্রীকে বন্দী করে রেখেছিলেন। এদিকে বাঙলার শশাঙ্কর সঙ্গে রাজ্যবর্দ্ধনের যখন জোর যুদ্ধ চলেছে, তখন এই যুদ্ধের সুযোগে রাজ্যশ্রী এক ফাঁকে মুক্তি পেয়ে আত্মগোপন করে থাকে। দেবগুপ্তের গৃহে রাজ্যশ্রী এই বিগ্রহটির আরাধনা করতো। রাজ্যশ্রী যাবার সময় এই বিগ্রহটি নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে করে। যাবার সময় পথে বিন্ধ্য পর্বতের বনে এই বিগ্রহটি হারিয়ে যায়। সেই সময় কোনো এক ব্রাহ্মণ এটিকে নিয়ে এসে গোয়ালিয়রে প্রতিষ্ঠা করেন। এখন যিনি এই মন্দিরের সেবায়েত, তিনি ঐ ব্রাহ্মণেরই বংশধর। স্থানীয় লোকেরা বলে: এই মন্দিরে এসে যদি কেউ একনিষ্ঠ ভাবে তার মনের বাসনা ব্যক্ত করে—তবে তার সে বাসনা পূরণ হয়।

দেবীকার কাজ হ'লো সন্ধ্যা-আরতির সময় নৃত্য করা। কত রাজা মহারাজা দূর দেশ থেকে আসেন শুধু আরতি দেখতে।

দেবীকার পরিচয় অমিয় সঠিক দিতে পারেনি। শুধু

বলেছিল, দেবীকার পূর্ব পরিচয় সে কিছুই জানে না, তবে দেবীকার মুখ থেকে ও মন্দিরের পুরোহিতের কাছ থেকে যা জানতে পেরেছে—তা হ'চ্ছে ঃ

দেবীকা কলাবন্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। সুকুমার কলা ও সৌন্দর্যের পূজারী বলে এদের নাম কলাবন্ত। নাচ, গান নিয়ে এরা সব সময় থাকে। এরা গন্ধর্বদেবের বংশধর। দেবসেবা ও সংগীত-চর্চাই এদের জীবনের লক্ষ্য। 'শালওয়ালী,' 'দেবলী,' 'বন্দিশ' সম্প্রদায়েব মত এদের খুব ছোট বেলায় বিয়ে হয়। বিয়ের উৎসব হয় খুব জাঁক জমকের সঙ্গে। নাচ ও গান হ'চ্ছে এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। কলাবন্ত সম্প্রদায়ভুক্ত যারা—তাদের বিয়ে হয় কারুকার্যময় একটি ছোরার সঙ্গে। এর কারণ, এরা ক্ষত্রিয়। বাইরের কারুর সঙ্গে এরা মেলামেশা করতে পারে না—তার প্রধান কারণ, এদের দেহ ভগবানকে উৎসর্গ করা।

দেবীকার রূপ দেখে যে-কেউ মুগ্ধ হবে। আঠারো বা জোর উনিশ বছর তার বয়স। বেশ মজবুত গড়ন। কিন্তু রঙটা তার তামাটে। সাধারণতঃ এ রকম গায়ের রঙ দেখা যায় না। দেবীকা বাঙলা মোটেই জানে না, তবে পরিষ্কার হিন্দী বলে।

সে দিন সকাল থেকে মাটি নিয়ে বসেছে অমিয়। স্টুডিওতে যখন সে থাকে, তখন তার বিনা অনুমতিতে কারুরই সেখানে ঢোকার হুকুম নেই। অমিয় দেবীকাকে সঙ্গে এনেছে তার মডেল করবে বলে। দেবীকা বসে থাকে স্টুডিওর ভেতরে একটা চত্বরে। স্থির, নিশ্চল মূর্তি। অমিয় মাটি দিয়ে গড়ে যায়

দেবীকার মূর্তি। নিটোল, নিরাভরণ দেহের—প্রতিটি ছন্দকে শিল্পী তার ভাস্কর্যে নতুন রূপ দেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মোছে অমিয়। ছুটি কাঠি আর আঙুলের চাপ দিয়ে গড়ে যায় – দেবীকার প্রতিমা।

দেবীকাকে সে এমনভাবে কখন দেখেনি। বিধাতার সৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেও গড়ে চলেছে তার মূর্তি। নিষ্প্রাণ ধাতুর মূর্তিতে সে সঞ্চারিত করবে নতুন চেতনা। ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পে নতুন এক ধারা সে প্রবর্তন করবে, যা অমিয়র জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে স্বীকৃত হবে।

শিল্পীর অবচেতন মনের প্রতিক্রীয়ায় যে মূর্তি সে আজ গড়ে চলেছে—তা যেন দেবীকার মূর্তি নয়। তার চোখে ভাসে গৌরী মূর্তি। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা তো অপ্সরী। মাতৃরূপা গৌরী মূর্তি সে তার অজ্ঞাতে গড়ে চলেছে। সেই আয়ত চক্ষু—হাস্যময়ী মূর্তি। জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি যেন সব কোথায় হারিয়ে যায়। সাশ্রুনয়নে বিমোহিত হয়ে অমিয় দেখে দেবীকাকে। নিশ্চল, ধাতব মূর্তির মত দেবীকা বসে আছে—আর অমিয়র চোখে ভেসে ওঠে ঃ গৌরীর মূর্তি।

এমনি করে সাতটা দিন কেটে যাবার পর—অমিয় যেন একটু মানসিক সুস্থতা ফিরে পায়। মনীষা ও সীতা অমিয়র এই খেয়ালী মনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। এতদিন ধরে তাকে তারা দেখে এসেছে, তাই অমিয়র এই শিল্পীমনের খেয়ালের জন্য তারা এতটুকু বিস্মিত হয় না।

কিন্তু নবারুণের মনে ক্রমেই যেন বিস্ময়ের বোঝা বেড়ে যায়। শিল্পানুরাগী ছাড়া অমিয়র এই খাম-খেয়ালী কেউই বরদাস্ত করবে না। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার কথা একবার মনে না এনে শুধু শিল্প-সাধনা করে চলাকে মনীষা, সীতা মেনে নিলেও, রূঢ় বাস্তববাদীর কাছে তা অসহ্য বলে নিশ্চয় মনে হবে। নবারুণের মত এই পরিবারের বাইরের সকলেই অমিয়র এই খেয়ালকে কঠোর সমলোচনা করে থাকে। স্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালীরা অমিয়র এই শিল্প-সাধনাকে বলে, স্নায়বিক দুর্বলতা, এক প্রকার বিকৃত ক্ষুধা!

॥ বার ॥

সীতা যখন এ বাড়ীতে এমনিভাবে অমিয়র সঙ্গে প্রথম আসে, তখন মনীষার মনের ভাব কী হ'য়েছিল—তা আমার জানা নেই। তবে দেবীকাকে দেখে সীতা বেশ একটু মুষড়ে পড়েছিল। মুখে সে একটি কথাও বলেনি। সংসারের কাজের মধ্যে সে নিজেকে আরো জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। মনীষা—নবারুণকে পেয়ে দেবীকার বিষয় চিন্তা করার সুযোগই পায়নি। তার মনে যে খেদ আছে—তা সে কোনো মুহূর্তে প্রকাশ করেনি।

সন্ধ্যাবেলায়—মনীষা, সীতা ও নবারুণ যখন ব'সে রাজ্যের কথা নিয়ে খোস গল্প করছে, তখন ধূমকেতুর মত হঠাৎ এসে

হাজির হলো অমিয়। অমিয়র সঙ্গে দেবীকা। অমিয়কে দেখে সকলে চুপ হয়ে যায়। কী কথা হ'চ্ছিল তা বোঝার আর উপায় নেই।

অমিয় বললে ঃ তোমাদের কথায় বোধ হয় ব্যাঘাত হ'লো?

মনীষা বললে ঃ না, ব্যাঘাত হবে কেন?

—তবে একটা অনুরোধ করবো তোমাদের, ব'লে অমিয় যেন সকলের অনুমতির জন্য একটু চুপ করে রইল।

নবারুণ বললে ঃ বলো—তোমার কথা।

অমিয় বললে ঃ তোমাদের সঙ্গে এ কদিন কথা বলার এতটুকু সময় পাইনি। আজ আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। তাই আজ তোমাদের একটু নাচ দেখার জন্য অনুরোধ করছি। দেবীকা খুব ভাল নাচে। তার নাচ দেখলে মনে হবে স্বর্গরাজ্যের অপ্সরী দেবতার অভিশাপে আমাদের মধ্যে এসে পড়েছে। দেখবে তোমরা? যদি দেখো তো এসো আমার স্টুডিওতে। ওখানেই বসে ওর নাচ আমরা দেখবো।

নবারুণ বললে ঃ চলো মনীষা, দেবীকার নাচ দেখে আসি। সময় কাটানোর জন্য নয়, দেবদাসীর নাচ দেখার আমার অনেক দিনেব লোভ আছে।

মনীষা বললে ঃ চলো।

নবারুণ বললে ঃ হাঁ—ওরা কলাবন্ত সম্প্রদায়ের মেয়ে। নাচ ওদের সম্পূর্ণ ঘরানা বস্তু। শিখতে হয় না। ওরা জন্মেই নাচতে শেখে।

অমিয় বলে: সীতা চলো। এমনিভাবে বসে থাকলে চলবে কেন? সীতাও ওঠে সকলের সঙ্গে।

স্টুডিওর মধ্যে নাচের আয়োজন। দেবীকার মূর্তিটিকে সামনে রেখে ধূপ ধুনো জ্বেলে দিয়েছে অমিয়।

স্টুডিওর মধ্যে একটি বড়ো প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হ'য়েছে। উঁচু কাঠের পিলসুজের ওপর রয়েছে প্রদীপটা। বর্মা মুল্লুক থেকে আমদানী করা এই কাঠের পীলসুজটায়, বুদ্ধের জন্ম থেকে নির্বাণ পর্যন্ত খোদাই করা রয়েছে সব ঘটনা।

অমিয় বললে: সীতা, তুমি যদি তোমার সরোদটা নিয়ে বসো —তা হ'লে খুব ভাল হয়।

সীতা খুব নম্রভাবে বললে: অনেকদিন আমার অভ্যাস নেই—বাজাতে অসুবিধা হবে।

অমিয় একবার সীতার দিকে তাকাল, আর কিছুই বললে না।

অমিয় দেবীকাকে বললে: ঘুঙুর পরে নাও। নিজেই তোমার নাচ সুরু করো—আমরা তোমার দর্শক।

দেবীকা নাচতে সুরু করল ঘুঙুর পরে। দেবদাসীর নিজস্ব নাচ। অমিয়র গড়া মৃন্ময় মূর্তিটাকে সামনে রেখে সুরু হ'ল নাচ। নর্তকীর নিজস্ব ভঙ্গীতে দেবীর আরাধনা থেকে বিসর্জন পর্যন্ত। প্রতিটি পদক্ষেপে মাতিয়ে তুললো সকলের মন।

দেবীকার খোঁপায় জড়ানো রয়েছে বকুল ফুলের গোড়ে মালা। গায়ে তার বকুল ফুলের গহনা। কোমরে জড়ানো মহীশূরের সাদা সিল্কের শাড়ী। উর্দ্ধাঙ্গে নর্তকীর ফিরোজা রঙের সার্টিনের কাঁচুলী।

এমন নাচ এর আগে এরা কেউই দেখেনি। দেহের ছন্দে যেন বিকশিত হ'য়ে উঠলো সুরের পদ্ম। সে কী ছন্দ!

নিবার্ক দর্শক হ'য়ে নবারুণ, মনীষা ও সীতা দেখতে লাগল দেবীকাকে। অমিয়র গড়া প্রসন্নমূর্তি—সকলের চোখে এক স্বপ্নের জাল বুনে দেয়। দেবীকার নাচ আর থামে না। আনন্দ ও বিষাদের ছায়া স্পষ্ট দেখা যায় দেবীকার মধ্যে। আবাহন ও বিসর্জনের মধ্যে যে প্রভেদ, তা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে দেবীকার নাচে।

প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় দেবীকাকে মনে হয়—সে যেন স্বর্গীয় সম্পদ অপহরণ ক'রে মর্তে তা বিলিয়ে দিচ্ছে। মন হরণ করার অভিপ্রায়ে। দেবীকার অঙ্গচালনায় মায়াচ্ছন্ন করে ফেলে স্টুডিওর অভ্যন্তরটি। ইন্দ্র সভার এই বুঝি ছিল পরিবেশ। এ নাচের বুঝি শেষ নেই। নাচতে নাচতে দেবীকা ঢলে পড়ে মাটিতে। নাচ থেমে যায়, কিন্তু নাচের রেশ বহুক্ষণ ধরে আচ্ছন্ন করে রাখে সকলকে।

সীতা দেবীকার নাচ যেন সহ্য করতে পারেনি, তাই সে কখন সকলের অলক্ষ্যে স্টুডিও ছেড়ে চলে গেছে—তা কেউই লক্ষ্য করেনি।

কিসের যেন একটা অভাব অনুভব করে সীতা। এ পরিবেশ তার বিষাক্ত মনে হয়। হাঁফিয়ে ওঠে সে এই নাচ দেখে। দুঃখে ও ক্ষোভে মনটা তার ভারী হ'য়ে ওঠে, তাই সে চলে যায় স্টুডিও থেকে। যতক্ষণ নাচ চলেছে—ততক্ষণ ধরে সীতা তার বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে কেঁদেছে। কেউ তা জানে না। সীতার

মনে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, সে আগুনে ছারখার হ'য়ে পুড়ে যায় তার মন। কিন্তু কে তার মনের খোঁজ রাখে? যে তা রাখতে পারে বা যার সে খবর রাখা উচিত, সে তা খোঁজ রাখেনি ব'লেই দুঃখে, লজ্জায় সীতা নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে শুধু কাঁদে।

অমিয় আসে সীতার ঘরে।

সীতাকে কাঁদতে দেখে অমিয়র মন ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে যায়। মনে মনে সে প্রশ্ন করে: এ কি হ'লো সীতার? সীতা কি তা হ'লে দেবীকাকে ঈর্ষা করে? সে কি অমিয়র ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়েছে? কেন, কেন সীতা আজ কাঁদবে!

অমিয় ধীরে ধীরে সীতার মাথার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর সে বলে: সীতা তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। দেবীকা দেবদাসী। তাকে ঈর্ষা করলে দেবতার কোপ হবে। দেবীকাকে আমি এনেছি আমার প্রয়োজনে। তুমি ভুল বুঝো না। দেবীকা দেবতার সম্পদ। যে মানুষের কামাতুর দৃষ্টি তার ওপর পড়বে, সে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। তুমি কথা বলো। দেবীকাই যদি তোমার দুঃখের কারণ হয়, তবে আমি তাকে কালই গোয়ালিয়র দিয়ে আসবো। তুমি আমার দিকে চোখ তুলে চেয়ে বলো—তোমার দুঃখের কারণ কি?

সীতা বলে: আমার দুঃখের কারণ তুমি। আমার জীবন ব্যর্থ! আমার ভালবাসা বুঝি বা কৃত্রিম!

সীতা কাঁদতে কাঁদতে আরো বলে: আমার সুখ, শান্তি,

আমার সব কিছুই তুমি—সব কিছু আজ যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি। তাইতো আজ একা নির্জনে আমি শোক করছি। আমার কথা ভেবে নিজের সুখ, শান্তি নষ্ট কোর না। মিনতি করছি—আমাকে তুমি একটু একা থাকতে দাও।

অমিয় কী বলবে—তা ঠিক করতে পারে না। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে সীতার বিছানায়। তারপর সীতাকে নিজের খুব কাছে টেনে, অমিয় বললে: একদিন তুমি বলেছিলে, আমার শিল্প সৃষ্টির তুমি হবে প্রেরণা। বহুদিন বহুরাত্রি তোমাতে আমাতে কাটিয়েছি স্টুডিওতে। তোমাকে না পেলে হয়তো আমার সব সাধনা ব্যর্থ হয়ে যেতো। কিন্তু আজ তোমার এ কি হ'লো সীতা? তোমার মনে ঝড় উঠেছে। কাল বৈশাখীর মত ঝড় বইলে—তোমার সংস্পর্শে যারা থাকবে—তারাও ঐ ঝড় থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না।

সীতা মৃদুস্বরে বললে: মেয়েদের নিয়ে তুমি ছবি আঁকো, তুমি শিল্পী—তাই রঙের আঁচড় কেটে নিজের মনকে রঙীন করে রাখো। আমাদেরও যে মন আছে তা তুমি বোঝ না বলেই—যত সব অনাসৃষ্টি আজ ঘটছে।

—তুমি দেবীকাকে ঈর্ষা করে নিজেকে ছোট কোর না। দেবীকা আমার শিল্পসৃষ্টির সরঞ্জাম ছাড়া কিছুই নয়। দিন দিন আমার ওপর তোমার শ্রদ্ধা কমে আসছে দেখছি। তাই তোমার এই ক্ষোভ, তোমার তাই এই আত্ম-বঞ্চনা।

অমিয়র কথায় সীতার কান্না যেন বেড়ে যায়। মনীষার মত

সীতার মনের দৃঢ়তা নেই। সীতা তাই বলে ফেলে : তোমাকে অবলম্বন করে বাঁচার লোভে এখানে এসেছিলাম। সে দিন ভাবিনি তুমি আমাকে সরিয়ে আর একজনকে এনে বসাবে আমার জায়গায়। আমি তোমাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসি—তাই তোমাকে হারাবার ভয়, নিজে বঞ্চিত হবার ভয়, আজ বেশী করে জেঁকে বসেছে আমার মনে। দিদি মহৎ, তাই সে আমাকে নিজের করে গ্রহণ করতে পেরেছে। অন্য কোনো মেয়ে হ'লে, হয়তো কেন, নিশ্চয় তা সহ্য করতে পারত না। আমাকে তুমি যদি না ভালবাস —তবে তা স্পষ্ট করে বলে দাওনা কেন? আমার উদরাতা নেই। আমি আমার পথ দেখে চলে যাব।

অমিয় এর জবাব দেবার কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না, এমন সময় ডাক এলো ভেতর থেকে খাবার জন্য।

সকাল বেলা সীতা গেছে বাগানে ফুলগাছের তদারক করতে। প্রদীপ, শিখা দুজনেই তার পিছু নিয়েছে। বাইরের বারন্দায় নবারুণকে বসে কাগজ পড়তে দেখে অমিয় এসে বসলো।

অমিয় বললে : তোমাকে নিয়েই আজকের দিনটা কাটাব বলে স্থির করেছি। মনীষা গেছে দেবীকাকে নিয়ে কোণারকের মন্দির দেখতে। ফিরতে তাদের দেরী হবে।

নবারুণ খোস গল্প পেলে কিছু চায় না। জীবনতো ক্ষণস্থায়ী। আজ যা আছে—কাল তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই অমিয় আনন্দ পাবার জন্য কত কী করে থাকে। ক্ষোভ,

অনুতাপ, মনোবেদনা—এসব থেকে সে চিরদিন নিজেকে দূরে রাখে। সে শিল্পী, তাই তার চোখ শুধু রঙের আবেশে সব সময় রঙীন হয়ে থাকে।

নবারুণ খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রেখে বললে: তোমার মনের আজ এ দৈন্য কেন অমিয়? আমাকে নিয়ে দিন কাটাতে তোমার বেশ অসুবিধা হবে।

—অসুবিধা কিসের? তোমাকে চিঠি দিয়ে আনিয়েছি গল্প করে কাটাবো বলে। হঠাৎ অর্ডার পেলুম মডেল করার তাই ছুটে গেছলুম গোয়ালিয়রে। তোমায় কী বলবো নবারুণ, যার অনুরোধে গোয়ালিয়র গেছলুম তিনি হ'চ্ছেন ওখানকার নাম-করা ধনী। পাথরের কাজের জন্য গোয়ালিয়র বিখ্যাত। তাই ওখানকার লোকেরা পাথরের কাজের খুব বেশী কদর করে না। ব্রোঞ্জের মূর্তি হবে। আর কার মূর্তি জানো?

—কার?

—দেবীকার।

—দেবীকার?

—হ্যাঁ। ধনীর খেয়াল। এর জন্য ঐ ধনীকে বহু টাকা দিতে হ'য়েছে মন্দিরের কায়কল্পে। দেবীকার আরতি-নৃত্য দেখে ঐ ধনী ব্যক্তিটি একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে যায়। মন্দিরের সেবায়তের বরাতটা খুব ভাল। ধনী ব্যক্তিটি দেবীকাকে দাবী করে। কিন্তু সেবায়েত জানিয়ে দেন: তা হয় না। দেবীকা তার দেহ কমলাক্ষীকে উৎসর্গ করেছে। তাকে যে কামনা করবে তার মৃত্যু

অনিবার্য। বহু অর্থ ব্যয় করে দেবীকাকে না পেয়ে, ঐ ধনী ব্যক্তিটি দেবীকার ব্রোঞ্জ মূর্তি নিজের ঘরে রাখা মনস্থ করেন। আর তাই আমার ডাক পড়েছিল গোয়ালিয়রে।

নবারুণ জিগ্যেস করলো: তাহ'লে দেবীকা তোমার সঙ্গে এলো কি করে?

—সে এক বিরাট ইতিহাস। মন্দিরের ধারে একটি ঘরে আমি ওর মূর্তি তৈরী করতুম। এই ক'দিন সামনে ওকে রেখে ওখানে আমি ওর মডেল করেছি। মন্দিরের পুরোহিত থেকে সকলেই দেবীকার মূর্তি দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেছে। আমার ওপর সেই ধনীর হুকুম হয়েছে কমলাক্ষীর মন্দিরের একটি মডেল করে দেওয়ার। আমি দেবীকার মূর্তিটা ঢালাই করতে দিয়ে চলে আসছি—এমন সময় দেবীকা আমার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়তে রাজী হ'লো না। আমি ওকে কত বোঝালুম। সে কিছুতেই কোনো কথা শুনলে না। দেবীকা আমাকে মিনতি করে বললে, আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো। তোমার সঙ্গে বেড়িয়ে আবার আমি ফিরে আসবো। পুরোহিত দেবীকার এই কথায় আপত্তি করে। কিন্তু দেবীকা তা অগ্রাহ্য করে চলে আসে আমার সঙ্গে। এখন আমি গোয়ালিয়র গেলে কী করে আমার মুখ দেখাব—তা ভেবেই পাচ্ছি না। দেবীকা বলেছে—সে ছায়ার মত আমার সঙ্গে থাকবে। একটি মুহূর্ত সে আমাকে ছেড়ে থাকবে না। আমিও বললাম, বেশ থাকো। তুমিই বলো নবারুণ—আমার অপরাধ কোথায়? আমি তাকে আনার মোটেই পক্ষপাতি

ছিলুম না, কিন্তু এখন দেখছি কী জানো—ওকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষেও বেশ কষ্টকর। এই দেখ না—দেবীকা আজ নেই, আমার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। তাইতো তোমার কাছে এলাম গল্প করতে।

নবারুণ বললে ঃ দেবীকা তাহ'লে আর ফিরবে না?

—কি করে ফিরবে বলো? ওকে সঙ্গে করে আমি নিয়ে যেতে পারবো না। তাইতো আমি মনে মনে উপায় খুঁজছি। দাওনা নবারুণ তুমি কোনো পরামর্শ।

—আমি কি পরামর্শ দেবো? তুমিতো ওকে ছেড়ে দু'দণ্ড থাকতে পারো না। তার ওপর, ওখানে যাওয়ার তো পথ তোমার বন্ধ।

—হ্যাঁ, একেবারে বন্ধ। আমারও আজকাল কী যেন হ'য়েছে। দেবীকাকে দেখতে আমার ভয়ানক ভাল লাগে। রাত্রে ছাদে শুয়ে শুয়ে আকাশ ভর্তি তারা দেখতে যেমন ভাল লাগে, তেমনি ভাল লাগে দেবীকাকে। সীতা বা মনীষাকে একথা আমি টের পেতে দিইনি। মনীষার মনটা খুবই ভাল। সে আমাকে সত্যি ভালবাসে। তাই আমি যাতে সুখী হই—সেই দিকে তার নজর বেশী। কিন্তু, সীতা অন্য প্রকৃতির। নিজের বিষয় সে বেশী করে চিন্তা করে। যেখানে আমাকে নিয়ে কোনো ব্যাপার, সেখানে সে ভয়ানক স্বার্থপর। কিছুতেই সে ত্যাগ স্বীকার করে না। মনীষা ও সীতা দু'জনেই আমাকে ভালবাসে, কিন্তু এক জনের ভালবাসার সঙ্গে আর এক জনের

ভালবাসার প্রভেদ অনেক। মেঘ আর জলের মধ্যে যা প্রভেদ। আমি হ'চ্ছি ওদের আকাশ। একজনের রূপ বর্ষণে, আরেক জনের তা নয়।

নবারুণ বললে: একটা কথা বলবে অমিয়?

—কি কথা?

—মনীষা, সীতা ও দেবীকার মধ্যে কাকে তুমি সবচেয়ে বেশী ভালবাস?

—এইখানেই তোমার কাছে আমি হার মানলুম। এদের তিনজনকেই আমি ভালবাসি। ভালবাসা ওজন করার মতো কোনো মানদণ্ড আমার নেই। তুমি তো বিজ্ঞান নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছ অনেক দিন। নিরীক্ষণ করে দেখ না, কোনো রকম তারতম্য দেখতে পাওয়া যায় কি না?

নবারুণ একটু হেসে বললে: আমাকে দিয়ে যাচাই করলে তুমি ঠকে যাবে। আমি ওসব বুঝিনে। আমি বুঝি ভোল্টেজ, এ্যাম্পায়ার বা জোর, কণ্ডেন্সার ও রেসিসটেন্সের শক্তি। ক্ষমতা বা অক্ষমতার কথা যদি বা বলতে পারি, তার বাইরে কোনো শক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। এই ব'লে আরো জোরে হাসতে থাকে নবারুণ।

বৃন্দাবন এসেছে চা নিয়ে। পিছনে তার সীতা। প্রদীপ ও শিখা ছুটে এসে দাঁড়ায় অমিয়র পাশে। অমিয় একটু আদর করে তার ছেলে ও মেয়েকে। প্রদীপ বলে: আমি শশাঙ্কবাবুর বাড়ীতে খেলতে যাব বাবা?

শশাঙ্কবাবু অমিয়র প্রতিবেশী। তাঁর বাড়ীর লাগাও অমিয়র বাড়ী। সে কারণে অমিয় আপত্তি না ক'রে প্রদীপকে বলে: যাও, কিন্তু বেশী বেলা কোর না। প্রদীপ চলে যায়।

সীতা ইতিমধ্যে চা তৈরী করে ফেলেছে। অমিয় নবারুণকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে ধরিয়ে টান দেয়। ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে যায় সীতার সামনা-সামনি। হাতে করে সীতা তা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অমিয় বললে: জীবনটা আমার কী রকম যেন ঘোলাটে হ'য়ে যাচ্ছে। আমি সব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

সীতা বললে: বর্ষণের আগে গুমোট করে। এটা বুঝি তার পূর্বাভাস।

নবারুণ বললে: জটিলতা না থাকলে জীবনের পূর্ণতা আসে না। পৃথিবীর যত বড় বড় শিল্পীর জীবনী খুঁজলে দেখা যায়—তাদেরও জীবনে সব সময়েই সংগ্রাম করতে হ'য়েছে। সেইতো সবচেয়ে বড়ো শিল্পী—যে যত অতৃপ্ত। বাসনা না থাকলে কী সৃষ্টি করা যায়। ঐ যে অতৃপ্তি, ঐটেই হ'চ্ছে প্রেরণা। ঐটেই হ'চ্ছে শিল্পীর এষণা।

অমিয় বললে: শিল্পী Goya-র নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। তাঁর মত প্রতিভাবান শিল্পী সে সময় ছিল না বললেই হয়। Goya-র *The Maja Nude* ছবিটা হ'চ্ছে কোনো এক ডাচেসের নগ্ন মূর্তি। শিল্পী এই ছবিটির দুটি কপি করেন। একটি ডিউকের জন্য, অপরটি তাঁর নিজের জন্য। আজো সে

ছবি মাদ্রিদের বিখ্যাত আর্ট গ্যালারীতে রয়েছে। Goya তাঁর ঐ ডাচেসের ছবিটা দেখতেন আর নতুন নতুন ছবি আঁকতেন। ঐ ডাচেস ছিল শিল্পীর জীবনের প্রেরণা। যাঁরা নিন্দুক—তাঁরা বলেছেন: এটা হ'চ্ছে শিল্পী Goya-র একপ্রকার মনোবিকার।

সীতা বললে: Goya ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক। নিজের ভাবে নিজেই বিভোর হ'য়ে থাকতেন। শিল্পীকে এমন শিল্প সৃষ্টি করতে হবে—যা কালান্তর ঘটাতে পারবে। তা না হলে সে শিল্প —শিল্পই নয়।

—তা যদি বলো সীতা, তোমাকে Baron Gros-এর দৃষ্টান্ত দিতে পারি। Baron Gros তো বিপ্লোবত্তর শিল্পী। নেপোলিয়নের ছবি এঁকে তিনি বিখ্যাত হ'য়েছিলেন, কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। আত্মহত্যার কারণ হ'চ্ছে—তিনি সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টি করতে পারেননি। শিল্পের প্রতি এত অনুরাগ আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।

নবারুণ সিগারেটে শেষবারের মত টান দিয়ে ফেলে দিল। তারপর সে বললে: শিল্পীরা সাধারণতঃ একটু ভাবপ্রবণ হয়। সেটাই তার প্রতিভার মাপকাঠি নয়।

অমিয় বললে: তোমাদের মতের সঙ্গে আমার বেশ গরমিল আছে। শিল্প ও শিল্পীর প্রসঙ্গে যখন কথা উঠলো, তখন আমি বলছি: জীবনের সঙ্গে শিল্পের একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। সাধনা না থাকলে সিদ্ধি হয় না। Ingres হচ্ছেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। Ingres-এর *La Source* ছবিটি শিল্পী মনের পরিচায়ক। ১৮২৪

সালে তিনি ঐ ছবিটি আঁকতে সুরু করেন—যখন তাঁর পঁচাত্তর বছর বয়স তখন সেই ছবি তাঁর আঁকা শেষ হয়। তার মানে বত্রিশ বছর ধরে Ingres একটি ছবি এঁকে ছিলেন। আসলে *La Source* ছবিটি হ'চ্ছে একটা নারী মূর্তি।

নবারুণ বললে: *La Source* তো একটি নগ্ন নারীর প্রতিকৃতি। নগ্নতাই কি আর্ট?

—তোমার কাছে Ingres-এর *La Source* একটি নগ্ন মূর্তি ছাড়া আর কি হতে পারে? কিন্তু সাধনার মূল্য নিরূপণ করবে কে? G. F. Watts-এর আঁকা *Hope*-তো তোমার কাছে তা হ'লে কিছুই নয়। একটি মানুষ গ্লোবের ওপর বসে আছে—আর তার হাতে রয়েছে Lyre। লণ্ডনের টেট্ গ্যালারীতে আজও সে ছবি আছে। কিন্তু Watts তাঁর ছবির তলায় লিখে দিয়েছিলেন: 'Appeal to the imagination and the heart, and kindle all that is best and noblest humanity.' *Hope* ছবির তাৎপর্য বুঝতে আর হয়তো কোনো কষ্ট করতে হয় না। Watts-এর *Love & Life* একটি অপূর্ব ছবি। তাঁর শিল্প প্রচেষ্টার সার্থক প্রকাশ। 'Love strong in immortal youth, guides life upwards over a rocky path, sheltering her with his broad wings from stormy winds. Even in this barren soil violets spring up where love has trod.' এই কথা বলে অমিয় চুপ করে যায়।

নবারুণ বললে : তোমরা মত আমি শিল্পকলা বুঝি না। তবে ভিক্টোরীয় যুগে যে সব চিত্রশিল্পী খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে Vincent Vangogh-এর ছবি আমার খুব ভাল লাগে। তাঁর *Prison Yard* চিত্রকরের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে স্বীকৃত। Vangogh নিজে এই ছবি সম্পর্কে বলেছিলেন : 'Whatever they may have done, are still human beings, doomed to feel and suffer.' তিনি ছিলেন বাস্তবধর্মী চিত্রকর। Watts এর মত তাঁর ভাব-প্রবণতা ছিল না।

অমিয় একটি সিগারেট ধরিয়ে বললে : এটা তর্কের বিষয়। শিল্পীর পরিচয় তাঁর শিল্প-কলায়। ব্যক্তিগত জীবন বা তাঁর সামাজিক পরিবেশ নিয়ে কথা বলার কোনো অর্থ হয় না। Jacob Epstein বা John Holmes প্রভৃতি শিল্পীর ছবি আজও পর্যন্ত বিশ্বের শিল্পানুরাগীদের কাছে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হ'য়ে থাকে। Velazquez-এর *Venus & Cupid* ৪৫,০০০ পাউণ্ডে বিক্রি হ'য়েছিল এবং সে টাকা ন্যাশানাল আর্ট কালেকসন ফাণ্ডে যায়।

সীতা অমিয়র কথার মাঝে বলে উঠলো : নবারুণ বাবুর কথা তুমি ধরতে পারনি। শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন কিছুটা তাঁর যশকে প্রতিহত করে থাকে। তোমার মতে Rambrandt তো একজন বিশিষ্ট শিল্পী। কিন্তু মানুষ Rambrant কি জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন? Hendrickje-র ছবি এঁকে তিনি তো বিখ্যাত হ'য়েছিলেন। কিন্তু Hendrickje ছিল

Rambrandt-এর বাড়ীর পরিচারিকা। তার প্রতিকৃতি আঁকায় কোনো অপরাধ নেই—যতটা অপরাধ এক স্ত্রী বর্তমান থাকা স্বত্বেও তাকে ত্যাগ করে বাড়ীর পরিচারিকাকে বিয়ে করা। শিল্পী হ'লেই কি প্রবল লালসা থাকবে? শিল্পকলার দোহাই দিয়ে করবে উচ্ছৃঙ্খলতা? সীতার যেন অন্য কোথায় ব্যথা আছে। আলোচনা হ'চ্ছিল শিল্পী ও শিল্প কলা নিয়ে। হঠাৎ এই ধরনের মন্তব্যের জন্য আলোচনায় একেবারের মত ছেদ পড়ল। অমিয় কিন্তু আর একটি কথাও বলেনি। কিন্তু সীতার কথায় তার মুখটা বেশ কঠিন হ'য়ে উঠলো। আস্তে আস্তে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে গেল।

অমিয় চলে যাবার পর নবারুণ সীতাকে বললে: আপনার কথায় অমিয় খুব আহত হ'য়েছে।

—আমি তার জন্য দুঃখিত। সীতা আরো বললে: পুরুষের যে কোনো আঘাত সহ্য করার জন্যই বোধ হয় মেয়েরা জন্মেছে। এই সহ্য করাটাই হ'চ্ছে বুঝি নারীত্বের মহিমা। আরো কিছু হয়তো সীতার বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা শেষ করার আগেই তার চোখ দুটি জলে ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেল। মুখ দিয়ে আর কোনো কথাই বেরুল না।

॥ তের ॥

স্বর্গদ্বারে গিয়েছিল মনীষা আর নবারুণ। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় ভারী সুন্দর। শুধু জল আর ঢেউ। ঢেউ-এর পর ঢেউ এসে মিলিয়ে যাচ্ছে পাড়ে। কৃষ্ণপক্ষ—সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় অন্ধকার হ'য়ে যায় চারিদিক।

ফেরার সময় নবারুণ বললে: কাল কলকাতায় যাচ্ছি। মনীষা ও নবারুণ হাত ধরাধরি করে ফিরছিল। মনীষা নবারুণের হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বললে: আরো কয়েকটা দিন থাকলে ভাল হ'ত।

—ভাল আর কি হ'তো? একদিন তো যেতেই হবে।

—কেন জানি না তোমাকে আজ ছাড়তে মন চাইছে না নবারুণ।

এই কথার পর দু'জনে অনেকক্ষণ হাত ধরাধরি করে চলে ফেরার পথ ধরে। পথের দু' পাশে দেবদারু গাছের সারি। সেই পথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ মনীষা দাঁড়িয়ে যায়। নবারুণ জিগ্যেস করলে: কি হ'লো?

মনীষা বলে: কিছু না।

দেবদারু গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় মনীষা।

নবারুণ মনীষার খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করে: সত্যি,

তোমার কি হ'লো বলতো ?

—তোমাকে যেতে দিতে মন চাইছে না।

মনীষার কণ্ঠস্বরে কান্নার আভাস পাওয়া যায়। নবারুণের বুকে মাথাটা রেখে কী যেন সে ভাবতে থাকে।

অনেকক্ষণ এমনি ভাবে চুপচাপ কাটে। নবারুণও কোনো কথা বলে না। বলার কোনো ভাষা নেই। বিচ্ছেদের কথা ভেবে দু'জনেরই মন ভারী হ'য়ে ওঠে।

নবারুণ মনীষার মাথা বুকে টেনে নিয়ে একটু মৃদু চাপ দিল। তার মুখটি ওপরের দিকে তুলে ধরলো। মনীষার চোখে আবেশের ছায়া। সারা আকাশ তারায় ভরে গেছে। দেবদারু গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাসের চলাফেরায়—বেশ একটা খস্ খস্ আওয়াজ শোনা যায়।

মনীষা মৃদুস্বরে বললে ঃ চলো এবার।

এইভাবে থাকাটা বোধ হয় শোভন নয়, তাই মনীষা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নবারুণের হাতের বাঁধন থেকে। আবার সুরু হলো পথ চলা।

পথটা আজ অন্য দিনের চেয়ে বেশী নির্জন। খানিকটা চলার পর নবারুণ বললে ঃ আর হয়তো তোমার সঙ্গে কোনদিন দেখা হবে না। তাই মনে হচ্ছে এই বুঝি আমাদের নাটকের শেষ অঙ্ক।

—ছিঃ, এমন কথা মনে এনো না নবারুণ। জান, এ কথায় আমি আঘাত পাই।

নবারুণ আর কিছু বললে না। শুধু মনীষার হাত ধরে চললো তাদের বাড়ীর দিকে। মনে হয় তার, জীবনে আর হয়তো কখন এই মুহূর্তটা ফিরে আসবে না। কানে তার কোথা থেকে যেন একটা কান্নার সুর বার বার এসে ধাক্কা মারছে। একদিকে মিলনের আনন্দ—অপর দিকে বিচ্ছেদের বেদনায়, তার মনটা আরো ভারী হ'য়ে উঠলো।

নবারুণ বললে: তোমার 'ঝরাপাতা' আমি শেষ করতে পারিনি। যদি অনুমতি দাও তো সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। এ ক'দিনের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার ঐটে হ'বে আমার একমাত্র সম্বল।

—তুমি কি সব পড়েছো?

—না। শেষ করতে পারিনি।

—'ঝরাপাতা' যে আমার লেখা—তা কি করে বুঝলে?

—প্রতিটি ছত্রে তোমাকে খুঁজে পাওয়া যায়। পড়তে পড়তে মনে হয়, তুমি যেন নিজের মুখে গল্প বলছো।

—ওটা আমার পাগলামি বলতে পারো। যখনই একলা মনে হ'য়েছে, মনটা খারাপ লেগেছে—তখনই খাতা নিয়ে বসে একটানা লিখে গেছি। কী যে লিখেছি—তা আমার মনে নেই। তবে যা মনে করে লিখেছি—তা আমার অতীতের দিনপঞ্জী থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনা। যার আদি নেই—অন্ত নেই। মাঝখানে সুরু হ'য়ে—শেষ হবার আগেই থেমে গেছে। পাতা ঝরে পড়ার আগে 'ঝরাপাতা' দেখাটা তোমার উচিত হয়নি।

—আমার অন্যায় হ'য়েছে মনীষা। নিজেকে আবিষ্কার

করে—পড়ার লোভ সামলাতে পারিনি। তখন বুঝিনি ওটা আমার জন্য নয়। এখন বুঝতে পেরেছি—ঐ খাতাটার মালিকানা স্বত্ব দিয়েছ অমিয়কে।

—মিথ্যে অভিমান করছো নবারুণ। আজকের এই মুহূর্তে তর্ক করলে আক্ষেপ থেকে যাবে। যতটুকু সময় তুমি কাছে আছ—কয়েকটা ভাল কথা বলো।

—ভাল কথা কবিতায় সাজানো থাকে। আমার কবিতা আসে না।

—তোমার নিজের কথা বলো। আমার কথা সব ফুরিয়ে গেছে। এখন কি মনে হচ্ছে জানো?—যদি তোমাকে চিরদিনের জন্য ধরে রাখতে পারতাম, যদি তোমাতে আমাতে দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় এমনি করে চলতে পারতাম—তার চেয়ে আর আনন্দের কিছুই থাকত না।

নবারুণ একটু ম্লান হেসে বললেঃ পারতে তুমি চিরদিনের জন্য আমাকে নিজস্ব করে পেতে। কিন্তু তোমার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেছিল। তাই সেদিন তুমি আমাকে আঘাত করতে সঙ্কোচ বোধ করনি।

—সে আঘাত আমি নিজেকে করেছিলাম। এর জন্য আমিও কম কষ্ট পাইনি। তোমার ভুলে থাকার অনেক উপায় আছে, কিন্তু আমার কান্না ছাড়া আর কোনো গতি নেই।—একটু দাঁড়াও।

নবারুণ দাঁড়িয়ে যায়। মনীষা চারিদিক দেখে প্রণাম করে

নবারুণকে। তারপর সে হাত দুটি ধরে বললে: আশীর্বাদ করো—ইহকালে তোমাকে না পেলেও—পরকালে যেন তোমাকে নিশ্চয় পাই। মৃত্যু হোক আমাদের মিলনের সেতু।

—এ তুমি কী অমঙ্গলের কথা বলছো। ইহকাল, পরকাল আমি বিশ্বাস করি না। মৃত্যু হ'চ্ছে কাল। মৃত্যু হ'চ্ছে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ। মৃত্যু যাদের কাছে মুক্তি বলে মনে হয়—তারা ভীরু। এটা তাদের মনের দৈন্য ছাড়া আর কিছু নয়।

—আমি আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তাই ঐটে সহজ পথ বলে মনে হ'লো।

কথাটা এইখানেই শেষ করা যেন ভাল। আজ অন্তত মনীষা যা বলে চলেছে—সবই তার মনের খেদে জ্বাল দেওয়া কথা। অমিয়কে বিয়ে করে সুখী নয়—এ কথাটা সে কোনো দিনই স্বীকার করেনি। কিন্তু যাকে অন্তর দিয়ে প্রতিনিয়ত ধ্যান করা হয়—তার কাছে নিজের মনের কথাটা গোপন রাখা যে কত কঠিন—তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চেয়েছিল মনীষা নিজের দুঃখ নিজের মনে আটকে রাখবে—কিন্তু নবারুণকে কাছে পেয়ে আর সে চেপে রাখতে পারেনি। নবারুণ যখন জেনেই ফেলেছে—তখন এতদিনকার সঞ্চিত বেদনা প্রকাশ করলে কিছুটা অন্তত মনের স্বস্তি হবে।

মনীষা বললে: তুমি চলে গেলে এখানে আমার থাকা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। তোমাকে ছাড়তে এত কষ্ট হবে জানলে, এখানে আসার জন্য তোমাকে অত পীড়াপীড়ি করতাম না—

এতদিন তোমাকে না দেখেই বেশ কেটে গিয়েছিল। তোমার কথা ভাবতুম। তোমাকে কল্পনা করতুম মনে মনে। এখন সামনা সামনি পেয়ে মনটা সজীব হ'য়ে উঠলো। জানি একদিন তোমার ওপর অধিকার জানালে—তুমি হয়তো মেনে নিতে, কিন্তু আজ আর আমার কোনো অধিকার নেই। সেদিক থেকে অচিরার সৌভাগ্য ঈর্ষা করার মতো।

মনীষা তার হাতটা ছাড়িয়ে নিল। বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছে গেছে। আলো ও আঁধারের লুকোচুরি ভাল নয়। কেমনতর যেন মনে হ'লো মনীষার।

নবারুণ বললে: আবার দেখা হবে—এই আশায় এখন বেঁচে থাকবো। বিধাতা পুরুষ নিশ্চয় চান না—আমাদের মিলন হোক। তা যদি চাইতেন—তবে এই সব অনাসৃষ্টি ঘটবে কেন!

—আচ্ছা তুমি যদি কোনদিন সকালে উঠে দেখ, আমি আমার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তোমার কাছে এসে হাজির হ'য়েছি। সেদিন তুমি আমায় গ্রহণ করবে?

—সে দিনের অপেক্ষায় রইলাম। আজ সে চিন্তা অনাবশ্যক। আজ যা নিয়ে আছি—তা তোমার ভালবাসার দান। দুঃখের জ্যোতিতে তা আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

—সে দিন যদি আমাকে ফিরিয়ে দাও—তবে দুঃখের আর আমার সীমা থাকবে না। কতদিন ইচ্ছে হ'য়েছে তোমার বাড়ীর পাশে বাসা করে থাকি। কিন্তু পারিনি শুধু এই ভয়ে যে, অচিরা হয়ত করুণার চোখে আমার দিকে তাকাবে। হয়তো সে এমন

কথা বলবে—যা সহ্য করার মত মেজাজ আমার থাকবে না। অজানা ভয়ে আমার মন সব সময়েই দিশেহারা।

—মনীষা, একদিন নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম যার কাছে—তাকে আজ ফেরত দেওয়ার মত কোনো শক্তিই আমার নেই। তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই—আমার মনের রূপ বদলে গেলেও—তোমার ছাপ সেখানে আজও অস্পষ্ট হ'য়ে যায়নি। যখনই তোমার ছাপ মনে পড়ে—তখনই ভাবি এ তোমার শেষের দান। আমার সমস্ত ভালবাসা দিয়ে বলছি, অচিরার মধ্যে তোমাকে আমি খুঁজি, সেখানে তোমাকে পাইনে বলেই নিজের তৈরী আগুনে নিজেকে সমর্পণ করতে কুণ্ঠিত হই না।

—আমিও তিলে তিলে পুড়ে মরছি। সে কথা তোমাকে ছাড়া আর কারুকেই বলা যায় না। এতদিন ভাবনা ছিল 'ঝরাপাতা' কী করে শেষ করবো। তুমি চলে গেলে আমি 'ঝরাপাতা' তোমাকে দিয়েই শেষ করবো।

নবারুণ মনীষার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে: এই কি আমাদের শেষ দেখা নাকি?

—না, তা আমি বলছি না। তবে—কবে, কোথায় আবার দেখা হবে—তার ভরসাও রাখি না।

আবার কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ চলতে থাকে। রাত্রের আকাশ তারার চুমকীতে চিক্ চিক্ করছে। দুটি নর নারীর অশান্ত হৃদয় কিছুতেই যেন তারা পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে চাইছে না।

—মনীষা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। সত্যি বলছি,

তোমাদের মধ্যে এসে আমি আমার পুরোনো দিনগুলোকে ফিরে পেয়েছিলাম। যেতে আমার এতটুকু মন চাইছে না। তবু আমায় যেতেই হবে। অচিরা জরুরী তার না করলে হয়তো আরো কটা দিন এখান থেকে যেতাম। এখন আর আমার নিজের কোনো সত্তা নাই।

—অনেক কাল পরে তোমাকে পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে গিয়েছিল। ভালবাসা হ'চ্ছে এক রকম নেশা। তোমার কথা ভাবতে ভয়ানক ভাল লাগে। তোমার একটু ছোঁয়ায়, সে যে কী অনুভূতি তা তোমাকে কেমন করে বোঝাবো। এ কেবল হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। এমন কোনো জোরালো কথা আমি খুঁজে পাচ্ছি না—যা বললে তুমি সঠিক বুঝতে পারো।

নবারুণ মনীষার হাতটা নিজের হাতে আবার তুলে নিল। তারপর ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করলো তার আঙুলগুলো। এরপর আর কোনো কথা হয়নি। হয়তো এরপর আর কোনো কথার প্রয়োজনই ছিল না।

ওরা যখন বাড়ী ফিরল, তখন অমিয় ও দেবীকা বাইরের বারন্দায় বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। অমিয়র সারা মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

মনীষা মুখে একটু হাসি এনে বললে: আমাদের জন্য বুঝি তোমরা খুব ভাবছিলে?

—না। অমিয়র কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক গম্ভীর শোনাল।

মনীষা অমিয়র কাছ থেকে এইভাবে কোনো উত্তর আশা করেনি, তাই সে বললে: তোমাদের চুপচাপ বসে থাকতে দেখে— আমার তাই ধারণা হ'য়েছিল: এসো নবারুণ ভেতরে এসো।

মনীষা আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ভেতরে যাওয়ার জন্য এগিয়ে যায়।

অমিয় বললে: দাঁড়াও মনীষা। তোমার একটা চিঠি আছে।

টেবিলের ওপর খোলা খামে একটা চিঠি পড়েছিল, অমিয় সেটা মনীষার হাতে তুলে দিল।

সারা বাড়ীটায় একটা থমথমে ভাব। ব্যাপারটা যে কী— তা মনীষা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অমিয়কে সে কোনদিন এইভাবে বসে থাকতে দেখেনি। তার সারা মুখে বিষাদের ছায়া। দেখলেই বোঝা যায়, কী যেন একটা ভাবনায় সে নিজেকে ঠিক সামলাতে পারছে না।

অমিয় বললে: অন্যায়ভাবে তোমার চিঠিটা পড়েছি, তার জন্য আমি দুঃখিত।

মনীষা চিঠিটা খুলে পড়ে:

দিদি,

তোমার সঙ্গে দেখা না করেই আজ আমি চললাম। আর কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। তোমার কাছ থেকে আমি যে স্নেহ পেয়েছি, তা আমি কোনদিনই ভুলবো না। দিদি জীবনটা আমার ভুলে ভরা, তাই অপরের পথের কণ্টক

হ'য়ে থাকতে মন চাইল না। একদিন তুমি আমাকে যে ঐশ্বর্য দিয়েছিলে, তা আমি রেখেই চলে এলাম। এর জন্য আজ আর আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আজ আমার সত্যি হার হয়েছে, তাই সেই পরাজয়ের গ্লানিতে মন আমার একেবারে ভেঙে গেছে। প্রদীপ ও শিখাকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে বেশ আমি কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু উপায় নেই। তুমি আমায় ক্ষমা কোর দিদি। মনের অবস্থা আমার ভাল নয়। অনেক কথাই ছিল যা তোমাকে বলে যাবো বলে ঠিক করেছিলাম, কিন্তু সব যেন এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে। দিদি, তুমি মহৎ। মনে মনে এই প্রার্থনা করি, জীবনে তুমি সুখী হও। কোনো অকল্যাণ যেন তোমাকে স্পর্শ না করে।

প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার সীতা

চিঠিটা শেষ করার পর মনীষার মনটা বেশ ভারী হ'য়ে উঠলো। আস্তে আস্তে চিঠিটা ভাঁজ করে সে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে চলে গেল তার শোবার ঘরে। সীতার দুঃখে মনীষা যেন বেশ কাতর হ'য়ে পড়লো মনে হয়।

॥ চৌদ্দ ॥

মিলিকে আজ দুপুরে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছে অচিরা। এত-দিন একা একা থেকে সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। সিনেমা, নাচ, গান, পার্টিতে ঘুরেও তার যেন প্রচুর অবসর। সময় যেন কাটতে চায় না। মাঝে অচিরা মিলিকে নিয়ে মোটরে মোগলসরাই পর্যন্ত ঘুরে এসেছিল। ওর বেশী এগোতে ওদের সাহস হয়নি। ফিরে এসেছে নিজের খেয়ালে। অচিরাই বরং চিরদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে, নবারুণ থেকেছে বাড়ীতে। কিন্তু, নবারুণ এবার চলে যাওয়ার পর তার বড় একা একা মনে হ'য়েছে। তাই আজ নিজের হাতে মনের মতন করে রান্না করে মিলিকে খাওয়াবে বলে অচিরা একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে। এত রকমের নতুন নতুন সব রান্না করে মিলিকে খাওয়াবে যে, মিলি খেয়ে অবাক হ'য়ে যাবে। অচিরা রান্না করে, আর মিলি তার পিছু পিছু ঘোরে। অচিরার এই পিছু পিছু ঘোরার জন্য ভয়ানক আপত্তি। সে বলেঃ না ভাই মিলি—তুই ঘরে বসে ম্যাগাজিন দেখ্। রান্না দেখলে খাওয়ার মজা থাকে না।

মিলি হাসে অচিরার কথায়। সে বলেঃ তুই এখনও বেশ ছেলেমানুষ আছিস।

মিলি এসে বসে শোবার ঘরে। অচিরা তার রান্নার কৌশল দেখাতে অনিচ্ছুক। বাবুর্চিকে মাংসর কালিয়া করতে দিয়ে সে এসে বসে মিলির কাছে।

দু'জনে মিলে চলে খোশ গল্প। রবার্ট টেলার থেকে সুরু

ক'রে বাট্রেণ্ড রাস্সেল পর্যন্ত। কিছুই বাদ যায় না এদের। এ মাসের—'ফটোপ্লে'-তে পোষাকের কী নতুন ডিজাইন দিয়েছে তাই নিয়ে খানিকটা বেশ গল্প চলে।

মিলি আবার প্রসাধন সামগ্রীর খোঁজ খবর রাখে বেশী। বিলাতী কাগজে নতুন সেণ্ট বা প্রসাধনের বিজ্ঞাপন মিলি খুব মন দিয়ে পড়ে থাকে।

কথায় কথায় মিলি অচিরাকে বললে ঃ জানিস অচিরা, আমি পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে ছোট এক শিশি 'স্যানেল' সেণ্ট আনিয়েছি।

অচিরা অবাক হ'য়ে বললে ঃ এত দাম!

—হ্যাঁ ভাই, এখানে ওসব সেণ্ট আনার ভয়ানক হাঙ্গামা। ইমপোর্ট লাইসেন্স, হার্ড কারেন্সি, স্টার্লিং খরচ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভয়নক ফ্যাচাঙ্।

—তুই কি করে আনালি?

—হুঁ, বলে মিলি কী রকম যেন মুখ চোখ করলো। এই রকম মুখ চোখ করার অর্থ দাঁড়ায়, মিলি বলেই এই অসাধ্য সাধন করেছে। অন্য কেউ হ'লে আনাতে পারতো না। এটা সম্পূর্ণ মিলির কৃতিত্ব। শেষে মিলি আবার সব কথা পরিষ্কার করে বললে ঃ আমাদের সঙ্গে বীথি সোম পড়তো—তোর মনে আছে?

অচিরা বললে ঃ কোন্ বীথি?

আরে সেই বীথি সোম, যে আমাদের স্কুলের স্পোর্টসে দৌড়নোয়, সাঁতারে ফার্স্ট হোত!

অচিরার এবার মনে পড়ে। সে বলে ওঠে ঃ হ্যাঁ···হ্যাঁ।

ছাট বীথি সোম—যার সাঁতারের পোষাকে ফটো বেরিয়েছিল 'ওম্যানস্ ও'ন্ উইক্‌লিতে।

মিলি বলে ওঠে: হ্যাঁ···হ্যাঁ সেই বীথি সোম। তার যে বয় ফ্রেণ্ড গিয়েছিলেন নিউইয়র্কে, কী একটা এজেন্সি নেওয়ার জন্যে, ফেরার সময় বীথির অনুরোধে—আমার জন্য 'স্যানেল' সেণ্ট ও 'সুইট্ পী' ফেস পাউডার এনে দিয়েছেন। 'সুইট পী'টা একেবারে আমার কলার সেডের সঙ্গে ম্যাচ করে এনেছেন।

অচিরা বললে: তুই খুব লাকি, মিলি। মিলি ও অচিরা যখন ঘনিষ্ঠভাবে তাদের নিজেদের খোশগল্পে মশগুল, তখন ছকু এসে বললে: সাহেব এসেছেন মেমসাহেব।

অচিরা উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে নবারুণ এসে ঢোকে তার ঘরে। ট্যাবি এসে ঘোরপাক খায় তার পায়ের কাছে। বহুদিন পরে প্রভুকে দেখে ট্যাবি একটু আদর পাবার জন্য ছটফট করতে থাকে। নবারুণ ট্যাবির মাথায় একটু নাড়া দিয়ে মিলিকে লক্ষ্য করে বললে: আপনি কতক্ষণ?

মিলি বললে: অনেকক্ষণ এসেছি। আজ আমার দুপুরে এখানে খাওয়ার নিমন্ত্রণ। ভালই হ'য়েছে আপনি আজ ফিরেছেন। সকলে মিলে বেশ আনন্দ করে খাওয়া যাবে।

—বেশ তাই হবে, বলে নবারুণ তার ঘরে যায়।

অচিরা কী মনে করে যেন নবারুণের পিছু পিছু এসে ঢুকলো তার ঘরে।

জামা কাপড় খুলতে খুলতে নবারুণ বললে: তোমার তার

পেয়ে চলে এলাম। কি ব্যাপার ?

অফিসে তোমার অনেক কাজ জমেছে। নতুন কয়েকটা এন্‌কোয়ারী এসেছে, তুমি ছাড়া তার কেউ টেণ্ডার দিতে পারছে না।

—তাই নাকি ? সুধাংশুবাবু তো চিঠিতে তার কোনো কথাই জানাননি। যাই হোক্, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

অচিরা বললে : সে কথা পরে হবে। তুমি এখন একটু বিশ্রাম করো।

খাবার টেবিলে বসে মিলিই প্রথম সুরু করলে : পুরী কেমন লাগলো আপনার ?

—বেশ ভাল। সকাল সন্ধ্যা—সমুদ্রের ধারে শুয়ে থেকে কাটিয়েছি। আমার ভয়ানক ভাল লেগেছে।

অচিরা বললে : তোমার শরীর তো কিছুই সারেনি।

—ওখানে থাকলে মন সারে।

মিলি এদের কথাবার্তার ধরনটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, তাই সে তার সহজ বুদ্ধি দিয়ে বলে ফেললে : আরো কিছুদিন থেকে মন ও শরীর দুইই সারিয়ে আন্‌লেন না কেন ?

—সময় কৈ ? এই তো ক'দিন মাত্র গেছি। এর মধ্যে বহু চিঠি পেয়েছি, তার ওপর জরুরী টেলিগ্রাম।

অচিরার কান দুটো এই কথায় লাল হ'য়ে ওঠে। নবারুণ অবশ্য—কথা প্রসঙ্গে এ কথা বলেছে। কিসের যেন একটা

প্রচ্ছন্ন ইংগীত রয়ে গেছে।

কথার মোড় ঘোরানোর জন্যই বোধ হয় মিলি সরাসরি বললে: এভাবে আমাদের দু' জনের মোটেই ভাল লাগছে না। তাই আমরা ঠিক করেছি অচিরার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেবো। আপনি এসেছেন আশীর্বাদটা আজ মেয়ের বাড়ী হ'য়ে যাক।

নবারুণ মিলির কথায় প্রথমটা একটু অবাক হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরেই আন্দাজ করে নিয়েছিল মিলি কী বলছে।

নবারুণ পরিহাসছলে বললে: বিয়েটা হ'চ্ছে জীবনের ছাড়পত্র। মেয়ে আমার নয়, অচিরার। আপনারা যখন দুজনেই এ বিয়ে স্থির করেছেন—তখন আজকে বসে দিনস্থির করে ফেলুন। হ্যাঁ ভাল কথা, বিয়ে কি হিন্দু মতে হবে?

—নিশ্চয়। অধিবাস, গায়ে হলুদ, তত্ত্ব, বিয়ে, বাসি বিয়ে এ সবই হবে।

—হ্যাঁ, তাই আমি জিগ্যেস করছিলুম! আমি তো ঠিক ওগুলো বুঝি না। আমাকে বললে জোর আমি খবরের কাগজে এন্‌গেজমেণ্ট-এর বিজ্ঞপ্তি ছেপে দিতে পারি।

হো···হো···করে হেসে ওঠে মিলি ও অচিরা।

পুতুলের বিয়ে দেবে বলে দুই সখীতে ঠিক করেছে। নবারুণের অনুমতি প্রার্থনা করার প্রধান কারণ বিয়ের খরচের বোঝা বইতে হবে নবারুণকে। তাই অচিরার ইংগীতে মিলি এই কথা তুলেছিল নবারুণের সামনে।

এখানে বিয়েটা প্রধান। স্ত্রী-আচার বা মেয়েলী যে সব প্রচলিত প্রথা আছে তা পালন করার জন্যই অচিরা বেছে নেয় কন্যাপক্ষ। বিয়ের দিন অচিরার বাড়ীতে উৎসব। আর ফুল-শয্যার দিন মিলির বাড়ী। মিলির মা মেয়ের ছেলেমানুষী দেখে প্রথমটা একটু হেসেছিলেন, পরে অবশ্য তিনিই এই বিয়েতে বেশী উৎসাহী হয়ে ওঠেন। নবারুণ মনে মনে ধরে নেয়, এইটেই হ'চ্ছে জরুরী টেলিগ্রাম করার কারণ। যাই হোক, তাকে আসতেই হতো এবং সীতার বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পর —আর তার ওখানে থাকাটা কিছুতেই উচিত হতো না। ভালই হ'য়েছে কলকাতায় ফিরে এসে।

নবারুণ বললে ঃ অচিরা আর আপনি যে ব্যবস্থাই করুন না কেন, আমি তাতে সম্মত আছি। বাঙলাদেশে অন্তত কন্যার অভিভাবক হ'লে ভাগ্যে লাঞ্ছনাই জোটে, তাই তা হ'তে আমি রাজী নই। তবে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আমাকে আপনারা পাবেন।

নবারুণের এই কথায় অচিরা মৃদু হাসে, কিন্তু মিলি উৎফুল্ল হ'য়ে এত জোরে হেসে ওঠে যে, এ বাড়ীর বাবুর্চি, খানসামারা অবাক হয়ে যায়। তারা ছুটে এসে আড়াল থেকে লক্ষ্য করে ব্যাপার কী।

নবারুণ বললে ঃ এবার আমি নিশ্চয় উঠতে পারি। বিয়ের দিন স্থির করে জানাবেন—আমি সেদিন উপস্থিত থাকবো।

অচিরা ও মিলি উঠে পড়লো। নবারুণ উঠে সটান গিয়ে

শুয়ে পড়লো তার বিছানায়। ট্রেন-জার্নি করায় শরীর তার খুব ক্লান্ত মনে হ'চ্ছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে নবারুণের মনে পড়ে মনীষার কথা। কী সুন্দর না দিনগুলো তার ওখানে কেটেছে। প্রথমে অবশ্য মনীষার সামনাসামনি হ'তে নবারুণের মনে কী রকম যেন একটা সঙ্কোচ হ'য়েছিল। মনীষা কিন্তু নবারুণকে পেয়ে বেশ সজীব হ'য়ে উঠেছিল। এই ক'দিনে তার জীবনের একটি অসম্পূর্ণ অধ্যায় সে সম্পূর্ণ করলে নবারুণকে দিয়ে। মনীষার প্রক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি মনে মনে ভাবতে ভাবতে কখন যে নবারুণ ঘুমিয়ে পড়ে—তা সে নিজেই জানে না।

॥ পনের ॥

আজ বিয়ের দিন।

রোশনচৌকি বসেছে সদরে। অচিরার মোমের পুতুল পরেছে বেনারসী জোড়। আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব—সবাই সকাল থেকে জমায়েত হ'চ্ছে বাড়ীতে। বিয়ের যাবতীয় আয়োজন করেছে অচিরা। খুব ভোরে এয়োরা জলসরে এসে ফিরেছে। একটু বেলায় মিলিদের বাড়ী থেকে গায়ে হলুদের তত্ত্ব এলো। মাছ, তেল, হলুদের সঙ্গে কাপড়, দৈ, মিষ্টি, সিঁদুর কৌটা। অচিরার প্রতিবেশীরা সঠিক বুঝতে পারে না—কার বিয়ে।

সকলের মনেই কৌতূহল। এই রকম সাড়ম্বরে যে পুতুলের বিয়ে হ'তে পারে—তা তারা কেউই বিশ্বাস করতে পারে না। বাইরের উঠোনটা তেরপাল দিয়ে ঘেরা হ'য়েছে। সেখানে হালুইকর বামুন এসে ভিয়ান বসিয়েছে। অচিরার ফর্দ মত সেখানে রান্না হ'চ্ছে।

এ বাড়ীর বেয়ারা, বাবুর্চি ও খানসামাদের আর নিস্তার নেই। সকাল থেকে সব কাজে লেগেছে।

নবারুণের বিয়ের সময়—এ সব কিছুই হয়নি। একেবারে বিলাতী কায়দায় বৈকালিক চায়ের আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু অচিরার সখ মেটাতে আজ পুতুলের বিয়েতে যে আয়োজন হ'য়েছে —তা সচরাচর সত্যিকারের বিয়েতে দেখা যায় না।

সন্ধ্যেবেলায় বর এলো। উলু ও শঙ্খধ্বনি দিয়ে তাকে বরণ করে নামালো অচিরা। বর ও বরযাত্রীরা সব এসে বসেছে বাইরের বৈঠকখানায়। নানা রঙের আলো ও ঝালর দিয়ে সাজান হ'য়েছে বাড়ীটা। অচিরা তার মনের মতো করে সব সাজিয়েছে। বেল ফুলের গন্ধে ও সানাই-এর সুরে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে সারা বাড়ীটা। একেবারে বিয়ে বাড়ীর পরিবেশ।

অচিরা আজ খুশিমত সেজেছে। আসমানী রঙের বেনারসী শাড়ী পরলে তাকে বেশ মানায়। তাই আজ ঐ কাপড় আর জড়োয়া গয়না পরে সে ব্যস্ত হ'য়ে চারিদিকে বেড়াচ্ছে। কনের মা, কাজের কী আর শেষ আছে! লোকজনদের অভ্যর্থনা করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এমনি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে

অচিরা একেবারে নবারুণের সামনাসামনি এসে পড়ে। সে নবারুণকে বললে : তুমি এখনো জামা কাপড় বদলে নিলে না ? কী আশ্চর্য্য ! যাও, যাও—কনের বাপ হ'য়ে এ রকম ভাবে ঘুরলে লোকে কি বলবে ? বরপক্ষের লোকেরা তোমাকে এই ভাবে দেখলে যে নিন্দে করবে।

নবারুণ হেসে বললে : আমি যে কন্যাকর্ত্তা। আমার অনেক কাজ। সেজেগুজে বেড়ালে চলবে কেন ?

না না, তা হয় না। সত্যি তো আর বিয়ে নয় যে তুমি সময় পাচ্ছ না। এ তো পুতুলের বিয়ে। সেজেগুজে আমরা সব কাজ করবো—তাতেই তো সবচেয়ে বেশী আনন্দ। তুমি কি বলো, তাই না ?

—তোমার আয়োজন দেখে তো মনে হয় না এ পুতুলের বিয়ে। বিয়ের সব উপকরণই তো রয়েছে। শুধু বর আর কনে মোমের পুতুল। ওরা কথা বলতে পারে না। ওদের হ'য়ে আমাদের কথা বলতে হয়।

—এ তো ভাল কথা। ওদের সুখ সুবিধের ভাবনা আমরা ভাববো। ওদের বিয়ের সঙ্কল্পকে যদি আমরা আমাদের সঙ্কল্প বলে গ্রহণ করি—তাতে কি তোমার আপত্তি আছে ?

—আপত্তি করার কথা নয়। তবে যে বিয়ে কৃত্রিম, তাতে আমার মন বসে না অচিরা। সব কিছু যদি কৃত্রিমতায় ভরে যায় তবে যা অকৃত্রিম তা খুঁজে বার করা বড়োই কঠিন হবে। বিয়েটা তোমার কাছে খেয়াল হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে তার গুরুত্ব

অনেক বেশী।

—এটা তর্কের বিষয়। আজ আর তর্ক করার আমার মন নেই। জীবনে অনেক কিছু থেকেই আমি বঞ্চিত হয়েছি। তার জন্য আমি এতটুকু ক্ষোভ করিনে। পাওয়া-না-পাওয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুধু তপস্যা করে চলেছি। জানি একদিন আমার তপস্যা করা সার্থক হবে। বিয়ে আমাদের হ'য়েছে, কিন্তু তা একেবারে অনাড়ম্বর ভাবে। আদালতের মোহর লাগানো নথীপত্রে তা সীমাবদ্ধ। মোহরে তারিখ ছিল ১৮ই জুন। আজও সেই ১৮ই জুন। যদি তোমার আপত্তি না থাকে—তবে এসো না আজ আমরা মোমের পুতুলের হ'য়ে মন্ত্র উচ্চারণ করি।

অচিরা এই কথাটা কী করে যেন বলে ফেললে। এ রকম কিছু বলার তার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। বলে ফেলে তার মনে অনুশোচনা হয় এই ভেবে যে, নবারুণের কাছে এই ভাবে নিজেকে প্রকাশ করা সত্যিই তার উচিত হয়নি।

নবারুণও একটু চিন্তায় পড়ে যায়। অচিরার সঙ্গে সেও হিসেব করেই কথা বলে। হঠাৎ অচিরা নবারুণের সামনা সামনি দাঁড়িয়ে এই সব কথা বলবে—তা সে কিছুতেই ঠাহর করে উঠতে পারেনি। নবারুণ বললেঃ এ তোমার কী উদ্ভট খেয়াল অচিরা, কনের মা হ'য়ে যদি আবার মন্ত্র পড়তে বসো—তবে তা হবে অসিদ্ধ। ওরা পুতুল—পুতুলের মতই বিয়ে হোক। মানুষের মত বিয়ে দিতে গেলে—চলবে কেন! তবে ১৮ জুনকে স্মরণ করে যদি তোমার কিছু করতে ইচ্ছে হয়—

তাতে আমার আপত্তি নেই। এই কথার মাঝে মিলি এসে বলে : কাজের বাড়ীতে দু'জনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করলে চলবে কি করে, কনেকে নিয়ে ছাদনাতলায় এসো। আমিও বরকে নিয়ে আসছি। গোধূলি লগ্নে বিয়ে হ'য়ে যাক। অচিরা ও নবারুণ মিলির কথায় হেসে ওঠে। মিলি একরকম ধাক্কা দিয়েই নিয়ে গেল অচিরাকে। যাবার সময় নবারুণকে শুধু বলে গেল : আসুন না আপনি, শুভদৃষ্টি হবে দেখবেন।

শুভদৃষ্টির সময় অচিরা ধরেছিল কনের পীঁড়ি, আর নবারুণ ধরেছিল বরের। পুতুলের মালা বদল হলো, কিন্তু শুভদৃষ্টি আর হলো না। একটি সাদা কাপড়কে চারজনে মিলে ধরেছিল চার কোণ থেকে। নাপিতের ছড়াকাটা হ'য়ে যাওয়ার পর অচিরা তাকালো নবারুণের দিকে। নবারুণের মুখে হাসি, চোখে এক নতুন দীপ্তি। কী যেন একটা ঘটে গেল এর মধ্যে। পুতুলের বিয়েতে সব কিছু হলো, শুধু হলো না শুভদৃষ্টি। বর কনেকে সামনে রেখে দৃষ্টি বিনিময় হলো নবারুণ ও অচিরার।

অচিরার চোখ খুশিতে ভরে যায়। এতদিন সে চাওয়া পাওয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল, হয়তো বা তাও ছিল না, কিন্তু আজ অচিরার মন কেন জানি না আনন্দে ভরে উঠেছে। আনন্দ আজ তার হৃদয়ের কানায় কানায় ভরে উপচে পড়ছে। মনের ওপর থেকে তার সকল বেদনা—কে যেন নিকিয়ে নিয়ে গেল এই মুহূর্তে। ভারী ভাল লাগে অচিরার।

আজকের এই বিয়ের কোনো ত্রুটিই হয়নি। ছাদনাতলা,

বরার্চনা, মুখচন্দ্রিকা, গৌরবচন, সম্প্রদান, সিঁদুর দান, এমন কী পাশা খেলাও হ'য়েছে। আর সদর দরজায় বসেছে রোশনচৌকি।

এক এক লগ্নে এক এক সুর ভেসে আসছে কানে। বাড়ীর পরিবেশটা এমনই হ'য়ে উঠেছে যে, এ বাড়ীকে সত্যিকারের বিয়ে বাড়ী নয় বলে কারুরই ভুল হবে না।

পরের দিন বাসি বিয়ে। ছাদনাতলায় বর কনেকে নিয়ে মেয়েদের ভীড়। এয়োস্ত্রীদের যা কিছু নিয়মকর্ম আছে—সবই একে একে হ'য়ে গেল। অচিরা ব্যস্ত। এ বিয়েতে যেন কোনো কিছুর ত্রুটি না হয়—তাই সব নিরীক্ষণ করে যাচ্ছে অচিরা।

নবারুণ সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আনমনে কী যেন ভাবছে। সদরের মাথায় মাচা করে বসানো হ'য়েছে রোশনচৌকি। সারাক্ষণ শুধু নানান সুরে সানাই বেজে চলেছে। অচিরার মত নবারুণের মনটা অত খুশি নয়। তবু যেন একটা এলোমেলো চিন্তা করতে থাকে নবারুণ। তার যেন উদাস উদাস ভাব। এমন সময় হঠাৎ একটা গাড়ী এসে থামলো সদরের সামনে। গাড়ী থেকে নেমে এলো মনীষা। পরনে তার থান কাপড়।

বিস্মিত হ'য়ে যায় নবারুণ মনীষাকে দেখে। ঝোড়ো হাওয়ার মত মনীষা এসে দাঁড়ায় নবারুণের মুখোমুখি।

আনন্দ ও বিস্ময়ে নবারুণ যেন কী রকম হয়ে যায়। মনের ভাব প্রকাশ পায় তার কথায়। মনীষাকে দেখে নবারুণ বলে ওঠে: এ কী মনীষা, তুমি!

—হ্যাঁ আমি। একদিন তুমি আমাকে আসতে বলেছিলে, তাই আজ এসেছি। তুমি চলে আসার পর মনটা খুব খারাপ হ'য়ে যায়। বহু চেষ্টা করেছি মনের শান্তি ফিরে পেতে, কিন্তু কিছুতেই তা ফিরে পেলাম না। শেষে মনে হলো—তোমার কাছে এলে হয়তো শান্তি পাবো। তাই আজ এসেছি।

—কিন্তু তোমার এ কি বেশ মনীষা?

—এ বেশ আমি নিজেই বেছে নিয়েছি।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে নবারুণ বললেঃ এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন। ভেতরে এসো।

মনীষার ভেতরে আসতে সঙ্কোচ হয়। সে বলেঃ নবারুণ, আমার জানা ছিল না তোমার বাড়ীতে আজ উৎসব। এই উৎসবের মাঝে আমার আসায় বিঘ্ন হবে।

—এ তুমি কি বলছো মনীষা? নবারুণ জোর দিয়ে বললেঃ ভেতরে এসো মনীষা, এভাবে এসে চলে যাওয়াটা ভাল দেখায় না।

—শোনো নবারুণ, আমি তোমার সঙ্গে শুধু দেখা করতে এসেছিলাম। আমার চোখের সামনে দেখেছি একটা সংসার এই ভাবে পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেছে। দেবীকা যেন ধূমকেতুর মত উদয় হ'য়েছিল। ধূমকেতু হ'চ্ছে অমঙ্গলের সংকেত। তুমি থাকতেই সীতা ও-বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। তুমি চলে আসার পর একদিন সকালে উঠে দেখি, দেবীকা ও অমিয় স্টুডিওতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

আরো বিস্মিত হ'য়ে নবারুণ প্রশ্ন করেঃ সে কি?

—হ্যাঁ নবারুণ। তারা দু'জনে আত্মহত্যা করেছে।

একটা বিকট হাসি হেসে ওঠে মনীষা। ওর মুখে চোখে কী রকম যেন ভাব। একটু থেমে সে বললে: এখন আমায় বিদায় দাও। আর কোনোদিন হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। তাই বাবার কাছে যাবার পথে এই দিক দিয়ে ঘুরে গেলাম। অমিয় ও দেবীকার মৃত্যুর জন্য পুলিশ আমাকে সন্দেহ করছে। হয়তো বিচারে আমার দীর্ঘদিনের শাস্তি হবে। আমার নামের সঙ্গে এমন এক কলঙ্ক জড়িয়ে থাকবে—যা সহজে কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। যাবার সময় শুধু একটা কথা তোমাকে বলি: আমার অনুরোধ, আমার জন্য কেউ যেন না দুঃখ করে। আমার প্রার্থনা, তুমি অন্তত আমাকে ভুলতে চেষ্টা করো। যদি কখনো কেউ তোমাকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তুমি আমার পরিচয় অস্বীকার ক'রো। ব'লো: আমাকে তুমি চেনো না।

একটু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠে মনীষা। বলে: নবারুণ, প্রেম মানুষকে যেমন মহান করে, তেমনি তাকে তলিয়ে নিয়ে যায় অতলে—কোনো চিহ্ন আর থাকে না। সকলে আমার দিকে সন্দেহের চোখে দেখে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি অন্তত অন্য লোকের মত আমাকে দেখবে না। এখন দেখছি—তুমি সাধারণ লোকের মত আমাকে দেখছো। ভাবছো আজ আমি একটা অপরাধী। একটা ক্রিমিন্যাল।

নবারুণ আবার অনুরোধ করলো মনীষাকে: অন্তত কিছুক্ষণের

জন্য ভেতরে এসে বসো।

—না না। উৎসবের বাড়ীতে আমার ছায়া পড়লে অকল্যাণ হবে তোমার।

নবারুণ বললে : তুমি থেকে যাও। এইভাবে চলে যাওয়া ভাল দেখায় না ?

—আমার পথ আছে। সেই পথে আমার যাত্রা সুরু হবে দেবীকা যেমন আমাদের মাঝে ধূমকেতুর মত উদয় হ'য়েছিল আমিও ঠিক তোমার সংসারে ধূমকেতুর মত আসতে চাই না নবারুণ, তোমাকে যে আজো আমি ভালবাসি! তোমার অমঙ্গল আমি যে কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না। আমাকে আজ বিদায় দাও। নিজে আমার কথা ভেবে দুঃখ পাবে। শুধু যাবার সময় একটা কথা তোমায় বলে যাই, তোমাকে ভালবাসি বলে এই পথ বেছে নিয়েছি। তোমাকে আজো ভালবাসি বলে এই দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করে নিলাম। আর একটা কথা অমিয়র মত পুরুষের বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না ভালবাসার নামে ওরা মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। মৃত্যুই ওদের জীবনের মহাশাস্তি। মৃত্যুই ওদের মহামুক্তি।

মনীষা শুধু একবার নবারুণের চোখের দিকে তাকাল নবারুণ স্পষ্ট দেখতে পেল মনীষার চোখ দুটি জলে ভরে গেছে তবু তার মুখে ম্লান হাসি। আর একটি কথা না বলে, মনীষা যে গাড়ী করে এসেছিল—সেই গাড়ী করে চলে গেল।

নবারুণ স্পষ্ট বুঝতে পারে, মনীষাই অমিয় ও দেবীকার

মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। কিন্তু কী যেন হঠাৎ একটা ঘটে গেল! মন থেকে নবারুণ তাকে কিছুতেই আহ্বান জানাতে পারল না। মনীষাকে নবারুণ অন্তর দিয়ে চায়, অন্তর দিয়ে তাকে ভালবাসে—কিন্তু এইভাবে সে মনীষাকে কোনোদিন চায় নি।

মনীষার চলে যাওয়া পথের দিকে নবারুণ একমনে চেয়ে থাকে। তখন সদর দরজার মাথায় রোশনচৌকিতে সানাই-এর একটা বুকফাটা কান্নার সুর একটানা বেজে চলেছে।

॥ শেষ ॥